বিজ্ঞানের মজার পাঠশালা

ড. জেবা ইসলাম সেরাজ সম্পাদিত

বিজ্ঞানের মজার পাঠশালা

বইটি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য। সীমিত সংখ্যক বই সবার কাছে পৌঁছানো সম্ভব নয়; এ জন্য তুমি যখন উপরের ক্লাসে উঠবে, বইটি তোমার ছোট ভাই-বোনকে দিয়ে দিও যেন তারাও এই বইটি পড়তে পারে।

প্রকাশকাল
মার্চ, ২০১৪

সম্পাদক
ড. জেবা ইসলাম সেরাজ

রচনা, সম্পাদনা ও গবেষণা পরিষদ
নাসরীন সুলতানা মিতু
আতিয়ার রহমান
ড. জেবা ইসলাম সেরাজ

শিল্প নির্দেশনা
নাসরীন সুলতানা মিতু

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
জুনায়েদ আজিম চৌধুরী

গ্রাফিকস
মাহবুব এলাহি

© ড. জেবা ইসলাম সেরাজ

SERAJ FOUNDATION
FOR DEVELOPMENT

ISBN : 978-984-33-6876-8

শুরুর কথা

আমি খুব গভীরভাবে বিশ্বাস করি, যেকোনো বিষয়ে শেখা আনন্দের হওয়া জরুরি। আর এই আনন্দ কয়েক গুণ বেশি হওয়া উচিত, যখন বিষয়টি হলো বিজ্ঞান। কারণ, বিজ্ঞান মানেই চার মলাটে বাঁধা একটা বই শুধু নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চলতে, ফিরতে বিজ্ঞানের জ্ঞানের ভূরি ভূরি বাস্তব উদাহরণ আমরা দেখি; আর সেটিই বিজ্ঞান শিক্ষাকে আরও প্রাঞ্জল ও আকর্ষণীয় করে তোলে। আবার উল্টো দিক থেকে দেখলে, বিজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনকে করে তোলে সহজ ও আরামপ্রদ।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে বিজ্ঞানের মতো একটি খটোমটো বিষয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। একটা চমৎকার উপায় হতে পারে ভিজুয়ালের ব্যবহার। ঠিক এই চেষ্টারই অংশ বইটি। ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান পাঠ্যবই থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাছাই করা হয়েছে এই বইয়ে। বিজ্ঞানের কয়েকটি মৌলিক ধারণার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেন যৌক্তিক চিন্তাধারা গড়ে ওঠে এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, কমিউনিটির ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যেন ইতিবাচক পরিবর্তন আসে, সেদিকে লক্ষ রেখে অত্যন্ত সতর্কভাবে এই অধ্যায়গুলো বাছাই করা হয়েছে। অসংখ্য বাস্তব উদাহরণ ব্যবহার করে কার্টুন ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে ধারণাগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কৌতূহলী করে তোলার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা নিজেরাই তাদের চারপাশের ঘটনাবলি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শেখে। এ ছাড়া তাদের অনুশীলনের জন্য দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু প্রজেক্ট ওয়ার্ক এবং মজার সব পরীক্ষা, যা তারা একক বা দলীয় কাজের মাধ্যমে হাতেকলমে করে দেখতে পারে।

এই বইতে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হবে নতুন দুজন বন্ধুর সঙ্গে; তাদের নাম লিপি ও পিয়াল। এই দুটি ছেলেমেয়ের জীবনে প্রতিদিনকার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও নিজের চারপাশ খুঁটিয়ে দেখার প্রবণতা গড়ে উঠবে। প্রত্যেক ছেলেমেয়েই এই চরিত্র দুটির মধ্যে নিজেদের নতুন করে খুঁজে পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস! আর সেই সঙ্গে তারা যদি নিজেদের পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে এবং তা উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে, সেটিই আমাদের সার্থকতা।

সব প্রজেক্টের মতো এই বইটির জন্মের একটা ছোট্ট গল্প আছে। গল্পের শুরু আমার দুই কন্যা সামিয়া সেরাজ ও সারাহ সেরাজের বিজ্ঞান শেখার অভিজ্ঞতা থেকে। এই দুই বোনের প্রিয় বিষয় ছিল বিজ্ঞান। কিন্তু তাদের পাঠ্য চমৎকার ইলাস্ট্রেটেড বইগুলো কোনোটাই এ দেশের ছিল না। সেখান থেকেই আমাদের মনে হলো, এ দেশের সাধারণ বাংলা মিডিয়ামের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান পড়াটাও হয়তো অনেক আনন্দের হতো এ রকম পাঠ্যপুস্তক থাকলে! কাজে নামার পর সামিয়া বেশ কিছু ভালো বই জোগাড় করল সাহায্যের জন্য, যেগুলো সবই ইংরেজিতে লেখা। কিন্তু বাংলা পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে এ ধরনের বাংলা বই করতে গিয়েই আমরা পড়লাম বিপাকে! বাংলায় বিজ্ঞানকে সহজবোধ্য এবং ইন্টারেস্টিং করে ছবি ও কার্টুনের মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য আমাদের প্রথমেই দরকার ছিল একজন ভালো আঁকিয়ে। এ ব্যাপারে সারাহর উদ্যোগে আমরা পাশে পেলাম ওর বন্ধু নাভিন এবং তার কাজিন মাকামে মাহমুদ। ঘটনাক্রমে মাকাম কার্টুন পত্রিকা উন্মাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় উন্মাদ সম্পাদক বিখ্যাত কার্টুনিস্ট আহসান হাবীবের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের একটা সুযোগও ঘটে গেল। বলতে গেলে হঠাৎ করেই! আহসান হাবীবের কাছে সাহায্য চাইতেই উনি পরিচয় করিয়ে দিলেন উন্মাদের সহকারী সম্পাদক কার্টুনিস্ট নাসরীন সুলতানা মিতুর সঙ্গে, ঘটনাক্রমে যাদের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বিজ্ঞান শিক্ষার ওপরেই। মিতুর সঙ্গে পুরোদমে কাজ শুরুর পর পুরো প্রজেক্টের ব্যবস্থাপনার ভার স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে কৃতজ্ঞ করেছেন টুগেদার কমিউনিকেশন্সের সিইও এস এ শাহ্‌রিয়ার রিপন। আরেকজন মানুষের কথা স্মরণ করতে হচ্ছে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও দুঃখের সঙ্গে, যিনি রিপনের সূত্রেই প্রজেক্টে যুক্ত হন, আতিয়ার রহমান; আমাদের শোকাহত করে আকস্মিকভাবে যিনি না-ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন বইটির কাজ শেষ হওয়ার আগেই। বইটি রচনায় এই বিদগ্ধ মানুষটির প্রয়াস কখনো ভোলার নয়।

আমি পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে সবার আন্তরিক সহযোগিতায় বইটির কাজ ভাল ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু শেষে যাঁর কথা না বললেই নয়, তিনি হচ্ছেন প্রফেসর ড. আহমাদ শামসুল ইসলাম। আমার বাবা। আমার জীবনের আদর্শ। বইটি শেষ হওয়ার পর তিনি পুরো বইটি পড়ে তাঁর বিচক্ষণ মতামত দিয়ে একে ঋদ্ধ করেছেন। এছাড়াও ধন্যবাদ দিতে হয় আমার শ্বশুর মোহাম্মদ সেরাজউদ্দিন ও শাশুড়ি ফাতেমা খাতুন, যাদের অনুপ্রেরণায় বইটি প্রকাশ হচ্ছে। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই স্বামী ড. তৌফিক এম. সেরাজকে, যিনি সাহায্যের হাত না বাড়ালে হয়তো বইটি কখনো আলোর মুখ দেখত না!
আশা করি, আমাদের এই শ্রম সার্থক হবে।

ড. জেবা ইসলাম সেরাজ
অধ্যাপক
প্রাণরসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন বিজ্ঞান নিয়ে আমার খুব আগ্রহ ছিল কিন্তু আমার চারপাশে সেই আগ্রহ মেটানোর মত কিছু ছিল না। যে পাঠ্যবইটি আমাদের পড়তে হত সেটি ছিল দায়সারা বিজ্ঞানের আনন্দটুকু সেখানে নেই। স্কুলে বিশাল একটা লাইব্রেরী ছিল সেখানে বিদেশ থেকে পাওয়া বিজ্ঞানের কিছু বই ছিল কিন্তু সেগুলো সব রেফারেন্স বই, বাসায় নেয়া দূরে থাকুক, অনেক সাধ্য-সাধনা করার পর লাইব্রেরীতেই খুব সাবধানে সেগুলো নাড়াচাড়া করার অনুমতি পাওয়া যেতো। তবে বাইরে থেকে দেখতে কাঠখোট্টা লাইব্রেরীয়ানের ভেতরে একটা কোমল হৃদয় ছিল, বিজ্ঞানের বইয়ের জন্যে আমার প্রবল আগ্রহ দেখে স্কুল ছুটির পর যখন আশে-পাশে কেউ নেই তখন তিনি সেই বইগুলো গোপনে আমাকে বাসায় নিতে দিতেন। সেই বইগুলো স্পর্শ করেই আমার সারা শরীরে উত্তেজনার একটা শিহরণ বয়ে যেতো। বাসায় এনে রাত জেগে সেগুলো পড়তাম, ভেতরে অসংখ্য বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্টের বর্ণনা ছিল, সেগুলো করার জন্যে দরকার বেশিরভাগ জিনিষপত্রই নেই, তারপরেও হাতের কাছে যেগুলো পাওয়া যেতো সেগুলো দিয়েই এক্সপেরিমেন্টগুলো করে দেখতাম। বইয়ের ভেতর বিদেশি ছেলেমেয়েগুলোর ছবি গুলো দেখে হিংসায় বুকের ভেতর জ্বলে-পুড়ে যেতো, মনে হতো আহা, আমারও যদি এই বাচ্চাগুলোর মতো সৌভাগ্য হতো, এক্সপেরিমেন্ট করার যন্ত্রপাতি থাকতো!

তারপর অর্ধশতাব্দী পার হয়ে গেছে, এখন কী অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে? সত্যি কথা বলতে কী মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয় নি। যারা স্বচ্ছল, যাদের বাবা মায়েরা শিক্ষিত, যারা সন্তানের শখ কিংবা ইচ্ছেটুকুকে গুরুত্ব দেন তারা হয়তো খুঁজে পেতে বিজ্ঞানের মজার কিছু বই তাদের ছেলেমেয়ের হাতে তুলে দেন। এক্সপেরিমেন্ট করার জন্যে ছোটখাটো জিনিষপত্র খুঁজে এনে দেন। সেই সৌভাগ্যবান ছেলেমেয়ে গুলো হয়তো ইন্টারনেটে বিজ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়। তাদের ভালো স্কুলে বিজ্ঞান মেলায় নিজেদের প্রজেক্ট ছাড়া করায় কিন্তু এর বাইরের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এখনো দায়সারা একটা বিজ্ঞানের পাঠ্যবই হাতে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বিজ্ঞানের এক্সপেরিমেন্টগুলোর বর্ণনা পড়ে কিন্তু সত্যি সত্যি কীভাবে সেগুলো করতে হবে কেউ তাকে বলে দেয় না। তাদের মনের ভেতর কতো রকম প্রশ্ন কিন্তু কাকে তারা জিজ্ঞেস করবে জানে না।

আমি ইচ্ছে করলে এই দুঃখের কাহিনী আরো লম্বা করতে পারতাম কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ যে বইয়ের ভূমিকায় আমি কথাগুলো বলছি সেই বইটি এক নজর দেখেই সবাই বুঝতে পারছে আমাদের দুঃখের দিন সমাপ্ত হতে যাচ্ছে। ষষ্ঠ শ্রেণির ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্যে তাদের পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি এই চমৎকার ওয়ার্কবুক তৈরি হয়েছে। বইটি দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, যে বয়সী ছেলেমেয়ের জন্যে লেখা হয়েছে তারা আনন্দে শিহরিত হবে। এই বইয়ে প্রত্যেকটি বিষয় কী চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কী সুন্দর ছবি, কতো চমৎকার ব্যাখ্যা। বিজ্ঞানের একটা বইয়ে কম বয়সী ছেলেমেয়েরা যা খুঁজে বেড়ায় তার সবকিছু এখানে আছে। এই বইটি সরকারের কোনো বড় প্রকল্প থেকে দাড়া করানো হয়নি, কোনো এনজিও'র পরিকল্পনা নয়, কোনো আন্তর্জাতিক সংগঠনের অবদান নয়। বিজ্ঞানের আগ্রহী কিছু মানুষের এই দেশে আর দেশের ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা থেকে এই বইয়ের জন্ম। তারা বিনামূল্যে কিছু ছেলেমেয়েদের হাতে এই বইটি তুলে দিতে চান। আমি আশা করছি দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এগিয়ে আসবে যেন শুধু অল্প কিছু ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে না দিয়ে বইটি এই দেশের ষষ্ঠ শ্রেণির সকল ছেলেমেয়ের হাতে তুলে দেয়া যায়। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞান পড়ায় আগ্রহ যেভাবে কমে আসছে সেটি দেশের জন্যে একটি ভয়ের ব্যাপার। এই বইটি যদি ষষ্ঠ শ্রেণির সকল ছেলেমেয়ের হাতে তুলে দেয়া যায় তাহলে তাদের সবার ভেতরে বিজ্ঞানের জন্যে যে আগ্রহ এবং ভালোবাসা জন্ম নেবে সেটি তাদের অনেকদূর এগিয়ে নেবে। একটু বড় হবার পর যখন তাদের বিজ্ঞান বিভাগ বেছে নেবার সময় হবে তখন অনেকেই বিজ্ঞানকে গ্রহণ করবে। দেশের অনেক বড় একটি সমস্যার সেটি হতে পারে চমৎকার বাস্তব একটি সমাধান।

এই চমৎকার বইটি দাড়া করানোর জন্যে যারা গবেষণা করেছেন, বইটি যারা লিখেছেন, যারা সম্পাদনা করেছেন, যারা ছবি একেঁছেন, যারা উৎসাহ দিয়েছেন তাদের সবার জন্যে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমাদের অনেক ভালোবাসার এই দেশটি এরকম অসংখ্য মানুষের নিঃস্বার্থ আন্তরিক পরিশ্রমের জন্যেই সামনে এগিয়ে যাবে, আমি সেটি মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি।

মুহাম্মদ জাফর ইকবাল

২৬.৪.১৪

বন্ধুরা, কেমন আছ সবাই! বিজ্ঞানের মজার জগতে তোমাদের স্বাগত!
প্রথমেই চলো পরিচিত হই আমাদের নতুন দুই বন্ধুর সঙ্গে। ওরা তোমাদেরই বয়সী, দুজনেই ক্লাস সিক্সে পড়ে। ওদের দুজনের নাম হলো– আচ্ছা, থাক; বাকিটা ওদের মুখেই বরং শোনা যাক।

আমি পিয়াল।

তোমরা সবাই কেমন আছ? ভালো তো?

আচ্ছা, তোমরা তো স্কুলে অনেক বিষয় পড়াশোনা করো। বিজ্ঞান বিষয়টা তোমাদের কেমন লাগে?

আমরা এই বইতে সবাই মিলে মজা করে বিজ্ঞানের অনেক কিছু নতুন করে শিখব। আমাদের এখানে কিচ্ছু মুখস্থ করতে হবে না; শুধু আমরা সত্যিকারের বিজ্ঞানীদের মতো করে অনেক কিছু পরীক্ষা করে শিখব! তারপর দেখবে, আমাদের চারপাশে কত মজার মজার বিষয় লুকিয়ে আছে, যেগুলো দিয়ে আমরা বিজ্ঞানকে বুঝতে পারি। চারপাশের এসব ঘটনা একটু খেয়াল করলেই দেখবে, বিজ্ঞান মোটেও কঠিন নয়, বরং অনেক মজার একটি বিষয়! সঙ্গে সঙ্গে দেখবে, স্কুলের পড়াটাও কত সহজ হয়ে যায়!

আর আমি লিপি।

পরিমাপ (MEASUREMENT)	**১০-৩৮**
পরিমাপের ধারণা	১২
পরিমাপের উৎপত্তি	১৩
পরিমাপের অতীত ও বর্তমান	১৫
পরিমাপের প্রকারভেদ	১৬
ভর, ওজন ও সময়	২৪
অনুশীলন	৩০
পদার্থ (MATTER)	**৩৯-৭১**
পদার্থের ধারণা	৪১
মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ	৪২
পদার্থের প্রতীক	৪৪
পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য	৪৫
বায়বীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য	৫০
ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন	৫২
মিশ্রণের উপাদানসমূহ পৃথক্করণ	৫৪
অনুশীলন	৫৯
বল, চাপ ও গতি (Force, Pressure and Motion)	**৭২-৯১**
বল, বলের পরিমাপ	৭৮
চাপ, চাপের পরিমাপ	৭৯
স্থিতি ও গতি	৮০

নানা রকম গতি ৮২
সরণ, দ্রুতি ও বেগ ৮৫
অনুশীলন ৮৭

কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা (Work, Energy and Power) ৯২-১১৬

কাজ ও কাজের পরিমাপ ৯৪
ক্ষমতা ও এর পরিমাপ ৯৮
শক্তি ও শক্তির বিভিন্ন রূপ ৯৯
শক্তির অবিনাশিতাবাদ সূত্র ১০৩
নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য শক্তি ১০৩
শক্তির উৎস ১০৪
অনুশীলন ১১০

জনসংখ্যা ও পরিবেশ (Population and our Environment) ১১৭-১৫২

আসমার গল্প ১২০
পরিবেশদূষণ ১৩০
বায়ুদূষণ ১৩০
বায়োগ্যাস ১৩৩
গ্রিনহাউজ ইফেক্ট ১৩৬
ওজোন স্তর রক্ষা ১৪১
পানিদূষণ ১৪৩
আর্সেনিক ১৪৪
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ১৪৯

নির্ঘণ্ট ১৫৩

প্রথম অধ্যায়

পরিমাপ (MEASUREMENT)

প্রথম অধ্যায়

পরিমাপ (MEASUREMENT)

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১। পরিমাপ কেন প্রয়োজন হয়, তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
২। পরিমাপের উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
৩। পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
৪। বিভিন্ন মৌলিক ও লব্ধ রাশির একক ব্যবহার করে পরিমাপ করতে পারব।
৫। দৈনন্দিন কাজে পরিমাপ ব্যবহার করতে পারব।

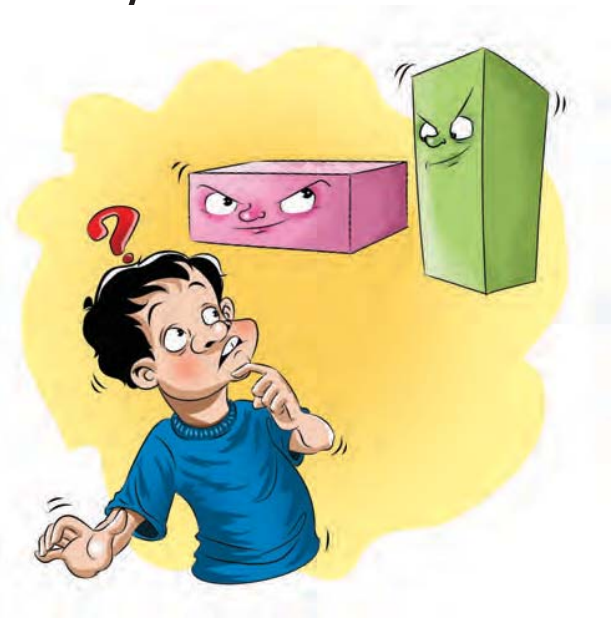

এ অধ্যায়ে কী শিখব

i) পরিমাপের ধারণা
ii) পরিমাপের উৎপত্তি
iii) পরিমাপের প্রকারভেদ
iv) পরিমাপের অতীত ও বর্তমান
v) পরিমাপের একক
vi) বিবিধ

পরিমাপের ধারণা

জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই পরিমাপ বা সোজা কথায় মাপজোকের ব্যাপারটা এসে যায়। যেমন, তিনজন মানুষ: ক=করিম, খ=খলিল, গ=গফুর। প্রশ্ন: কে বড়? এ প্রশ্নের একক কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, লম্বায় বা দৈর্ঘ্যে 'ক' বড়, ওজনে বা ভরে 'খ' বড়, আর বয়সে 'গ' বড়।

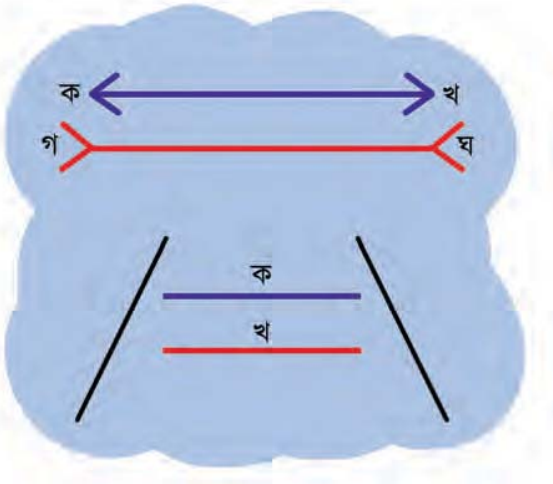

আবার কিছু ক্ষেত্রে এই ব্যাপারগুলো এত সহজে বলা যায় না। কখ ও গঘ দুটি সরলরেখার মধ্যে কোনটি বেশি লম্বা? অনেকেই চট করে বলবে, অবশ্যই গঘ। অথচ মাপলে দেখা যাবে, কখ ও গঘ দুটোরই দৈর্ঘ্য পরস্পর সমান। আবার ক ও খ দুটো সরলরেখার মধ্যে কোনটি বেশি লম্বা? একনজরে 'ক' কে বেশি লম্বা মনে হলেও আসলে দুটোই পরস্পর সমান লম্বা।

একইভাবে বাস্কেটবল, ফুটবল, টেনিসবল ও ক্রিকেটবলের মধ্যে কোনটি আকারে বড়, তা চট করে বলা যাবে না। অনুমান করে বললে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পরিমাপের উৎপত্তি

প্রয়োজনের তাগিদেই পরিমাপের উৎপত্তি। কোনোটা লম্বায় ছোট, কোনোটা লম্বায় বড়; কোনোটা ওজনে ভারী, কোনোটা হালকা ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই পরিমাপের ধারণাটি মানুষের মাথায় আসে। এরপর সেগুলো বিভিন্ন প্রয়োজনে কাজে লাগানো হয়। যেমন: বাবা ও তার দশ বছর বয়সী ছেলে– দুজনের জন্য দুটি পাঞ্জাবি বানাতে কতটুকু কাপড় লাগবে? বাবার জন্য যতটুকু লাগবে, ছেলের জন্যও কি তাই?

এবার বিবেচনা করি, দুই বস্তা চাল। উঁচু করে তুলতে গিয়ে একটিও তুলতে পারলাম না। তাহলে কি বলা যাবে, উভয় বস্তার ওজন পরস্পর সমান? না। কেন?
এখানে কোন বস্তার ওজন বেশি, তা দাঁড়িপাল্লায় মেপে বলতে হবে।

আবার যদি ধরি, দুই বন্ধু একই স্কুলে পড়ে। তাদের একজনের বাড়ি স্কুল থেকে ২০০ মিটার দূরে, অন্যজনের ৩০০ মিটার দূরে। দুজন একই সময়ে স্কুলে পৌঁছায়। কীভাবে সম্ভব? দুজনেই সকাল সাড়ে নয়টায় বাড়ি থেকে বের হলে ৩০০ মিটার দূর থেকে আসা ছেলেটিকে কী করতে হবে? হ্যাঁ, দ্রুত হাঁটতে হবে।

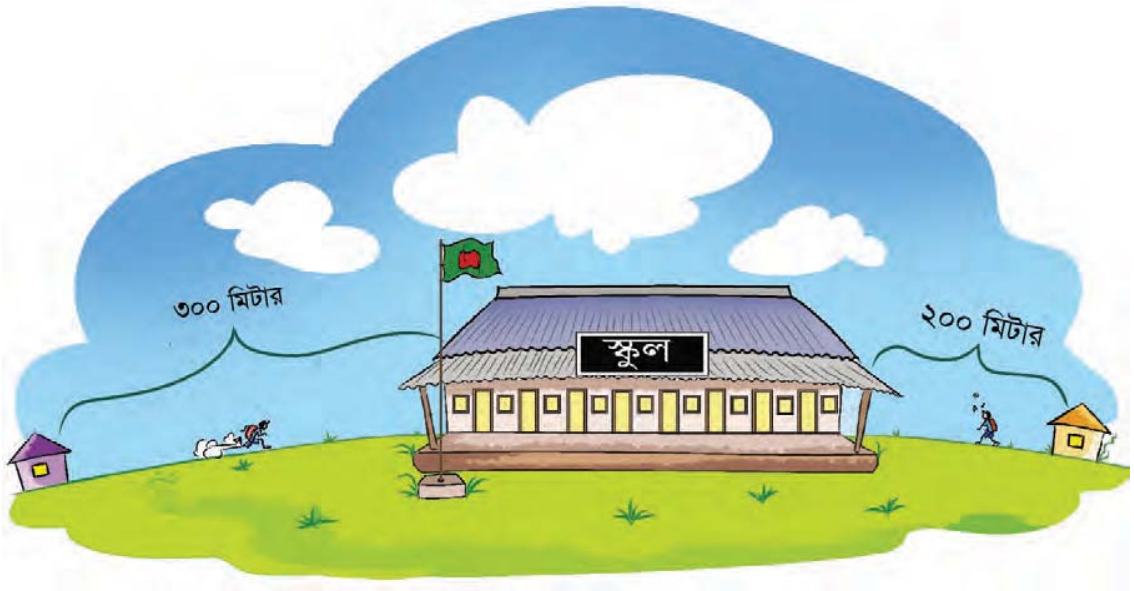

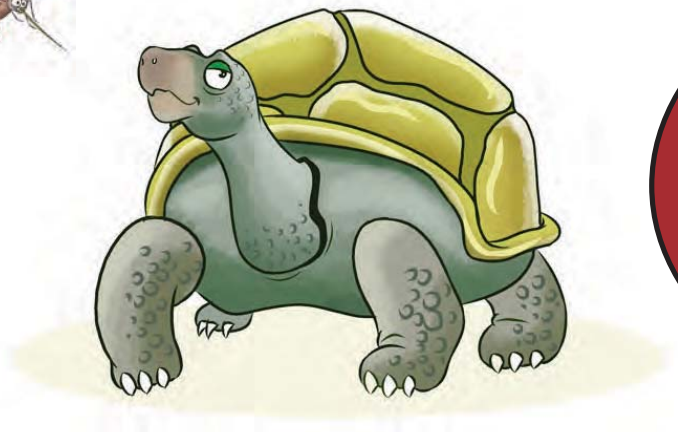

জানো কি?

একটা পুরুষ মশা বাঁচে মাত্র চার থেকে ছয় সপ্তাহ, যেখানে গ্যালাপোগাস দ্বীপে বৃহৎ কচ্ছপেরা এমনকি দুই শ বছর বাঁচে!

পরিমাপের অতীত ও বর্তমান

কাজ: সবাই হাত দিয়ে বেঞ্চটা মেপে দেখি তো কয় হাত? সব মানুষের হাত ও পায়ের দৈর্ঘ্য কি একই রকম?

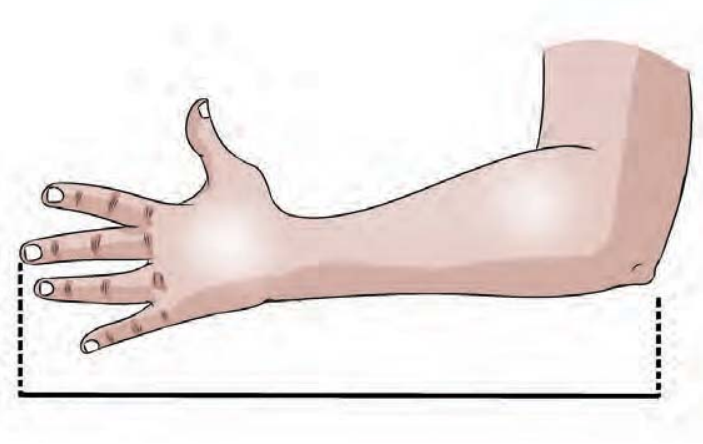

এ রকম হাত বা পায়ের মাপ দিয়ে করা হিসাব সঠিকতার নিশ্চয়তা দেয় না বলে ধীরে ধীরে অধিকতর গ্রহণযোগ্য পরিমাপের প্রচলন হয়। আসে মেট্রিক পদ্ধতি (Metric System) যা আবার দুই প্রকার: দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের এককের হিসাবে–

i) সেন্টিমিটার-গ্রাম–সেকেন্ড বা সি. জি. এস (C.G.S) পদ্ধতি

এবং

ii) মিটার-কিলোগ্রাম-সেকেন্ড বা এম. কে. এস (M.K.S) পদ্ধতি।

১৯৬০ সাল থেকে সব দেশের জন্য একটিমাত্র এককের পদ্ধতি চালু হয়; তার নামও আন্তর্জাতিক পদ্ধতি (System International বা সংক্ষেপে S.I পদ্ধতি)। এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের একক যথাক্রমে মিটার, কিলোগ্রাম ও সেকেন্ড। অর্থাৎ M.K.S পদ্ধতিই এখন S.I।

পরিমাপের প্রকারভেদ:

পরিমাপ নানা প্রকারের। এর মধ্যে তিনটি মৌলিক পরিমাপ হচ্ছে:

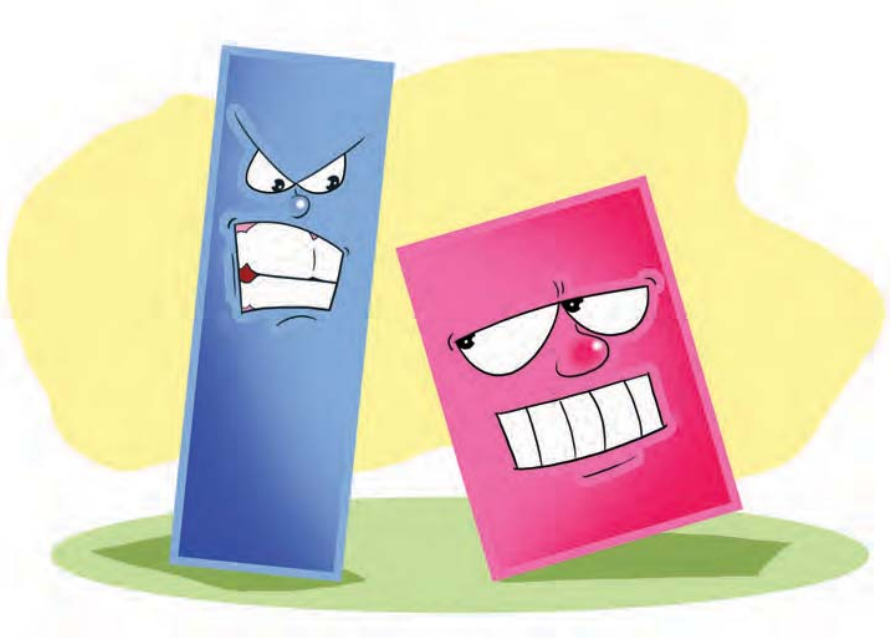

দৈর্ঘ্য (Length) (= লম্বা, চওড়া, উচ্চতা)
ভর (Mass) (= ভারী, হালকা)
সময় (Time) (= বয়স, কখন, কয়টায়, কতক্ষণ যাবত...)

দুটো ক্ষেত্র বিবেচনা করো। একটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৪ মিটার ও ৩ মিটার; অন্যটির ৬ মিটার ও ২ মিটার। কোন ক্ষেত্রটি বড়? উত্তরটা চট করে বলা যাবে না। এ ক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রের পরিমাপ বের করতে হবে, অর্থাৎ কোন ক্ষেত্র কতটুকু জায়গা নিয়ে বিস্তৃত, তা বের করতে হবে। এই পরিমাপকে বলে 'ক্ষেত্রফল' নির্ণয়। ওপরের প্রদত্ত ক্ষেত্র দুটির মধ্যে প্রথমটির ক্ষেত্রফল
(Area = A) = দৈর্ঘ্য x প্রস্থ = ৪ মি. x ৩ মি. = ১২ বর্গ মি.
দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য x প্রস্থ = ৬ মি. x ২ মি. = ১২ বর্গ মি.

উভয় ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পরস্পর সমান, তাহলে আমরা বলতে পারি, ক্ষেত্র দুটো পরস্পর সমান। এখানে দৈর্ঘ্যের দুটি পরিমাপ (৪ মি. ও ৩ মি. বা ৬ মি. ও ২ মি.) ব্যবহার করে ক্ষেত্রফল বের করা হয়েছে।

অনিয়মিত আকৃতির ক্ষেত্রর ক্ষেত্রফল

অনিয়মিত আকৃতির ক্ষেত্রে/তলের (যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ সুনির্দিষ্ট নয়) ক্ষেত্রফল বের করা হয়, সঠিকভাবে বললে কাছাকাছি পরিমাপ বের করা হয় ভিন্ন পদ্ধতিতে। প্রথমে ক্ষেত্রটিকে ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত করে সেগুলোর সংখ্যা গণনা করা হয়। গণনার সময় যেসব বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অর্ধেক একক বা তার চেয়ে বেশি, সেগুলোকেও পূর্ণ বর্গক্ষেত্র ধরা হয়। অর্ধেক এককের চেয়ে কম ক্ষেত্রফলের বর্গক্ষেত্রগুলোকে গণনা করা হয় না।

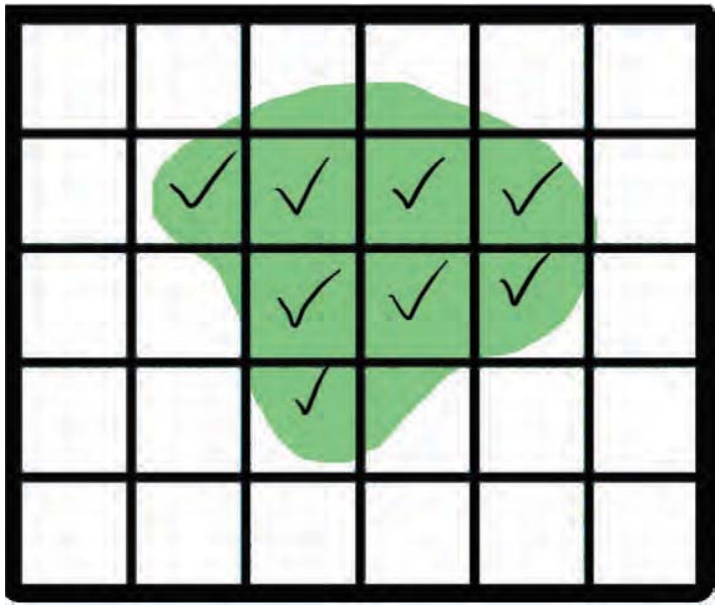

উদাহরণ:

ওপরের চিত্রে মোট পূর্ণ বর্গক্ষেত্রের সংখ্যা (চিহ্নিত) = ৮টি।

ধরি, প্রতিটি বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য = ১ সে. মি.
তাহলে প্রতিটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = ১ সে. মি. X ১ সে. মি. = ১ বর্গ সে. মি.

অতএব, অনিয়মিত আকৃতির ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল = ৮ X ১ বর্গ সে. মি. = ৮ বর্গ সে. মি.

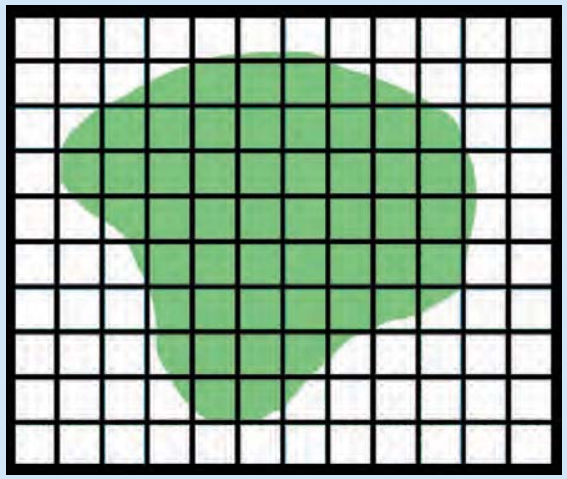

হিসাবটা নিজেরাই করি

মোট বর্গক্ষেত্রের সংখ্যা = _ _ _ _ _ টি

প্রতিটি বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য = _ _ _ _ _ মি. মি.

প্রতিটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = _ _ _ _ X _ _ _ _ = _ _ _ _

অতএব, অনিয়মিত আকৃতির ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল

= _ _ _ _ _ X _ _ _ _ _

= _ _ _ _ _ বর্গ মি. মি.

এই ফলাফলটি আগের ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করে দেখো।

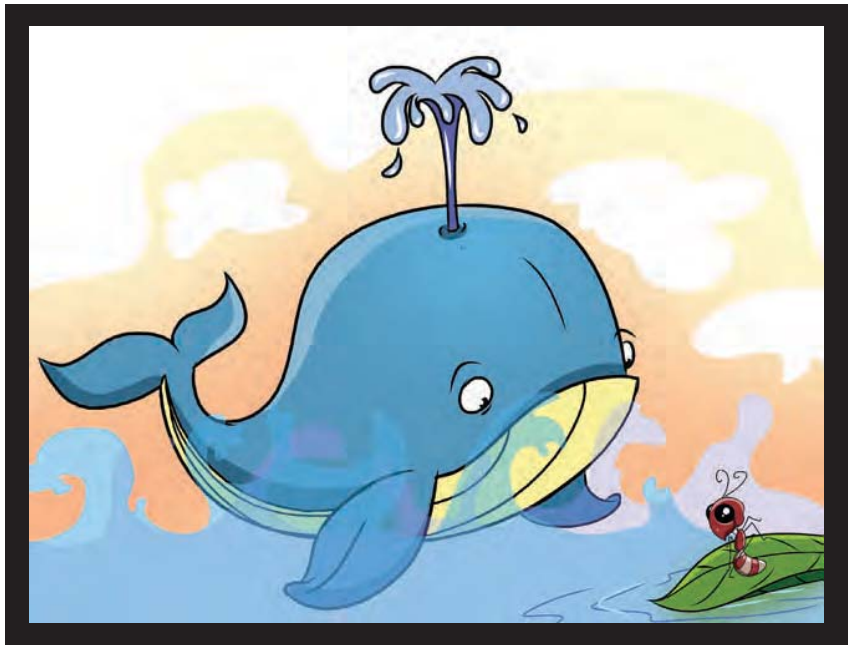

এবার দুটো চৌবাচ্চা বিবেচনা করি; যার প্রথমটির ভেতরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ২ মি., ১ মি. ও ৫০ সে. মি. বা ১/২ মি.;
অন্যটির যথাক্রমে ১১/২ মি., ১১/২ মি. ও ১/২ মি.।
কোনটিতে বেশি পানি ধরবে?

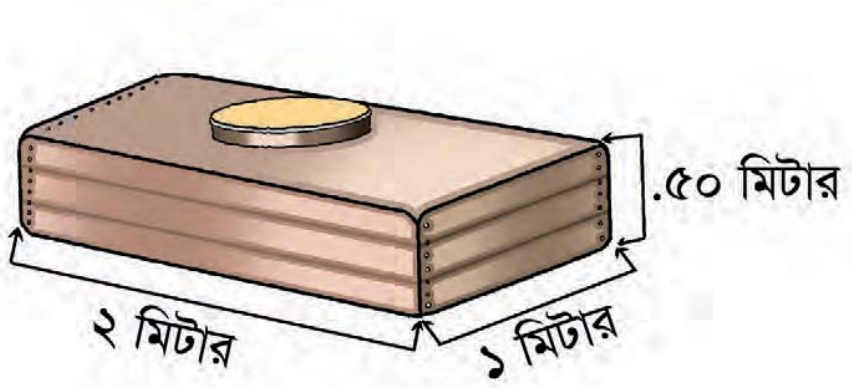

আবারও সেই একই সমস্যা। উভয় চৌবাচ্চার ভেতরের আয়তন (Volume = V) বের করা ছাড়া নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না।
আয়তন = দৈর্ঘ্য X প্রস্থ X উচ্চতা

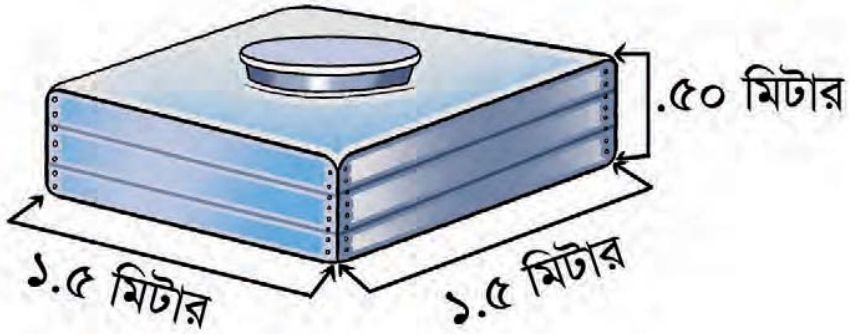

প্রথম চৌবাচ্চার V
= ২ x১ x১/২ ঘন মি.
= ১ ঘন মি.

দ্বিতীয় চৌবাচ্চার V
= ১১/২ x ১১/২ x ১/২ ঘন মি.
= ১.১২৫ ঘন মি.

যেহেতু, দ্বিতীয় চৌবাচ্চার আয়তন বেশি, তাই এবার নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, দ্বিতীয় চৌবাচ্চায় বেশি পানি ধরবে। এখানে আয়তন বের করা হয়েছে দৈর্ঘ্যের তিনটি পরিমাপের সাহায্যে। এভাবে, মৌলিক একাধিক পরিমাপের ভিত্তিতে যেসব পরিমাপ পাওয়া যায়, সেগুলোকে বলে লব্ধ (Derived) পরিমাপ। সেই হিসাবে ক্ষেত্রফল এবং আয়তন লব্ধ পরিমাপ।

লব্ধ পরিমাপের আরও উদাহরণ

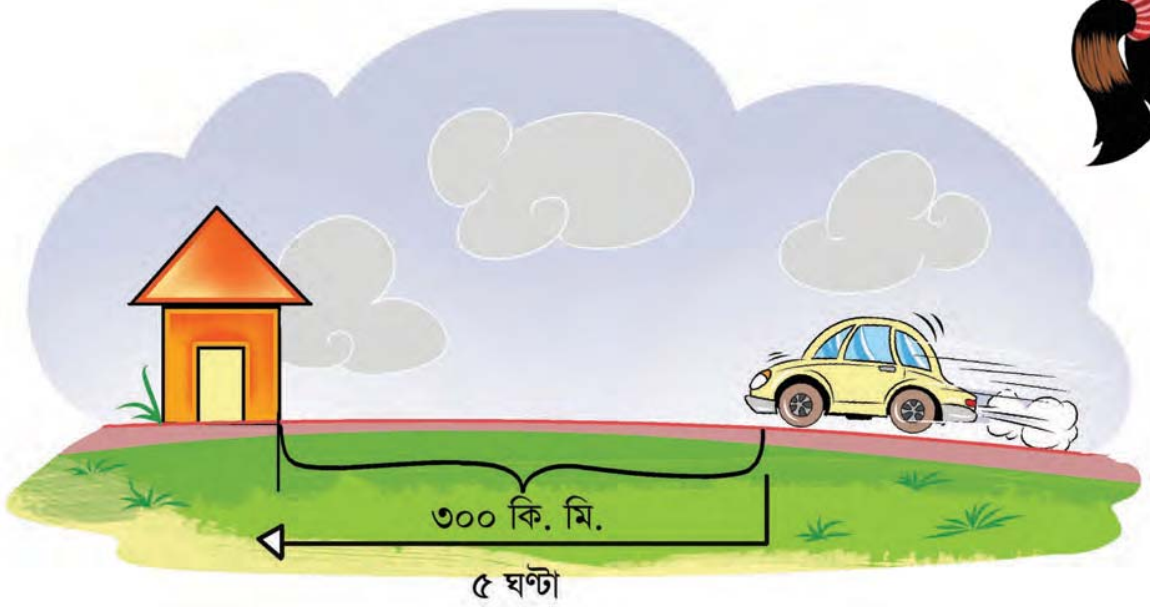

১টি গাড়ি ৫ ঘণ্টায় ৩০০ কি. মি. অতিক্রম করল।
গাড়িটির গড় গতিবেগ কত?

গড় গতিবেগ = মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব/মোট সময়
= ৩০০ কি. মি./৫ ঘণ্টা
= ৬০ কি. মি./ঘণ্টা

এখানে গতিবেগ বের করতে দৈর্ঘ্যের পরিমাপ কিলোমিটার এবং সময়ের পরিমাপ ঘণ্টা ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

যেকোনো পরিমাপের ক্ষেত্রে সাধারণত একটি সংখ্যা (হতে পারে সেটি ভগ্নাংশ) এবং তার সঙ্গে একটি একক ব্যবহার করে প্রকাশ করা হয়। যেমন, ১ মি., ২ কেজি, ৪ বর্গ মি., ৫ সেকেন্ড, ৯৮°C ইত্যাদি।

ঢাকা থেকে টঙ্গীর দূরত্ব কতটুকু, সেটা মিটার স্কেলে মাপা যাবে না। দৈর্ঘ্যের একক ছোট থেকে বড় অনেকগুলো। এখানে মজা হচ্ছে, কোনো একটি একক থেকে ঠিক তার ওপরের ধাপে যেতে ১০ দিয়ে গুণ এবং ঠিক তার নিচের ধাপে যেতে ১/১০ দিয়ে গুণ (বা ১০ দিয়ে ভাগ) করতে হয়। যেমন;

১ মি. মি. $\xrightarrow{\times ১০}$ ১ সে. মি. $\xrightarrow{\times ১০}$ ১ ডেসি. মি. $\xrightarrow{\times ১০}$ ১ মি. $\xrightarrow{\times ১০}$ ১ ডেকা মি.
$\xrightarrow{\times ১০}$ ১ হেক্টো মি. $\xrightarrow{\times ১০}$ ১ কি. মি.

১ মি. মি. $\xleftarrow{\times ১/১০}$ ১ সে. মি. $\xleftarrow{\times ১/১০}$ ১ ডেসি. মি. $\xleftarrow{\times ১/১০}$ ১ মি. $\xleftarrow{\times ১/১০}$ ১ ডেকা মি.
$\xleftarrow{\times ১/১০}$ ১ হেক্টো মি. $\xleftarrow{\times ১/১০}$ ১ কি. মি.

শব্দ	অর্থ	উদাহরণ
কিলো	১০০০	২ কিলো ভোল্ট = ২ x ১০০০ ভোল্ট = ২০০০ ভোল্ট
হেক্টো	১০০	৩ হেক্টো গ্রাম = ৩ x ১০০ গ্রাম = ৩০০ গ্রাম
ডেকা	১০	৪ ডেকা মি. = ৪ x ১০ মি = ৪০ মি.
ডেসি	১/১০	৫ ডেসি মি. = ৫ x ১/১০ মি. = ১/২ মি.
সেমি	১/১০০	১০ সে. মি. = ১০ x ১/১০০ মি. = ১/১০ মি.
মিলি	১/১০০০	২০০ মি. মি. = ২০০ x ১/১০০০ মি. = ১/৫ মি.

তবে ভরের ক্ষেত্রে কিলোগ্রামের চেয়েও বড় দুটো একক আছে, যেমন:

১০০ কি. গ্রা. = ১ কুইন্টাল

১০০০ কি. গ্রা. = ১ মেট্রিক টন

বোঝাইকৃত ট্রাকের ভর
হিসাব করতে টন...

...তরিতরকারি ও চাল-ডালের ক্ষেত্রে
কিলোগ্রাম, সোনা-রুপার ক্ষেত্রে গ্রাম ব্যবহার করা হয়।

কোনো বস্তুর পরিমাপ করা মানে আদর্শ পরিমাপের তুলনায় বস্তুটি কত গুণ বা কত ভগ্নাংশ সেটা বোঝানো হয়। যেমন; ৫ মিটার লম্বা রশি মানে আদর্শ ১ মিটারের তুলনায় রশিটি ৫ গুণ; অর্থাৎ রশিটি থেকে ১ মিটার দৈর্ঘ্যের ৫টি টুকরা পাওয়া যাবে।

ভর, ওজন ও সময়

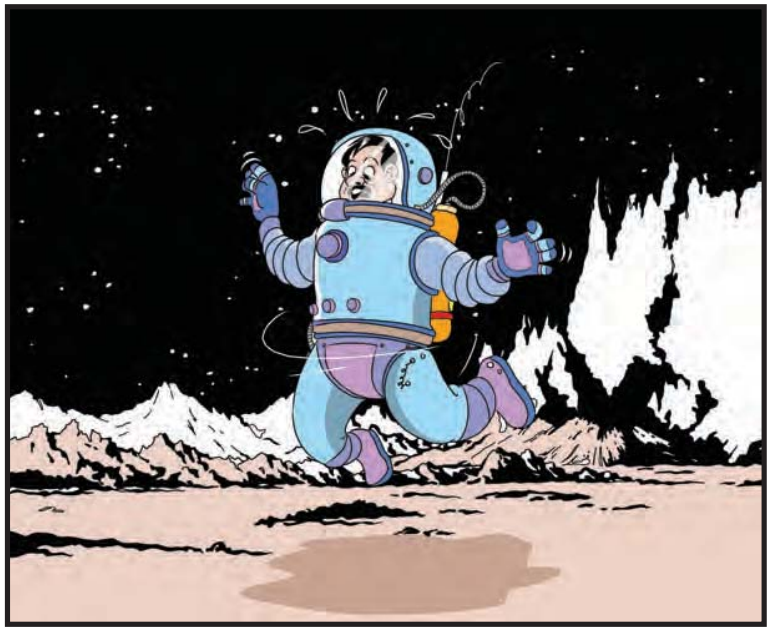

পৃথিবীতে তোমার যা ওজন, চাঁদে গেলে সেই তোমারই ওজন হবে তার ৬ ভাগের ১ ভাগ। অথচ পৃথিবীতে তুমি যত বড় ছিলে, চাঁদে গেলেও তুমি তত বড়ই থাকছ। এটা হচ্ছে 'ভর', যা মহাবিশ্বের সর্বত্র একই; কিন্তু ওজন বিভিন্ন হতে পারে। কারণ, ওজন হচ্ছে বস্তুটাকে (ভরটাকে) পৃথিবী কত জোরে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, অর্থাৎ বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলই হচ্ছে ওজন। আবার বস্তুর ভর যত বেশি, এই আকর্ষণ বলও তত বেশি হয়। যেহেতু, পৃথিবীর ভর চাঁদের চেয়ে অনেক বেশি এবং সেই কারণে চাঁদের আকর্ষণ বল পৃথিবীর আকর্ষণ বলের ৬ ভাগের ১ ভাগ, তাই চাঁদে তোমার ওজন অনেক কমে যায়।

যেহেতু ওজন এক প্রকার বল, এবং বলের একক নিউটন; কাজেই ওজনের এককও নিউটন। আর ভরের একক 'কিলোগ্রাম'। পৃথিবীতে ১ কেজি ভরের ওজন প্রায় ১০ নিউটন।

সময়ের একক

সময়ের ছোট একক হিসাবে আমরা সেকেন্ড ব্যবহার করে থাকি।

১ সেকেন্ড = ১/৬০ মিনিট

= ১/(৬০ X ৬০) ঘণ্টা [যেহেতু ৬০ মিনিট = ১ ঘণ্টা]

= ১/(৬০ X ৬০ X ২৪) দিন [যেহেতু ২৪ ঘণ্টা = ১ দিন]

= ১/৮৬৪০০ দিন

১ বছর = ৩৬৫ ১/৪ দিন

১ দিনে বা ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবী নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে পুরো এক চক্কর ঘোরে; আর ১ বছরে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে পুরো ১ চক্কর ঘুরে আসে।

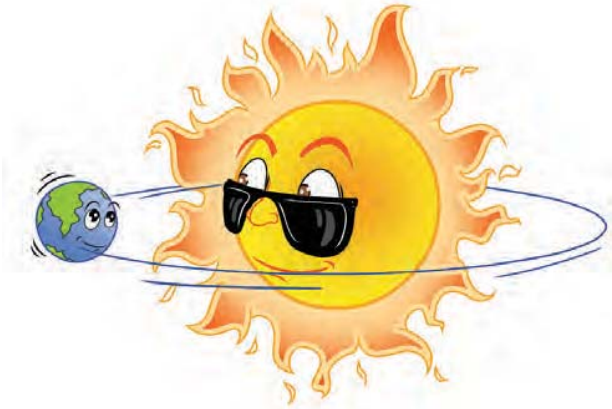

ঘনত্ব এবং অনিয়মিত আকৃতির বস্তুর ও তরলের আয়তন

ক্ষেত্রফল ও আয়তন সম্পর্কে আমরা অনেকটা জেনেছি। প্রশ্ন হচ্ছে, ১ কেজি লোহার চেয়ে ১ কেজি চালের আয়তন বেশি কেন?

আবার দুটো ১ লি. আয়তনের পাত্র যথাক্রমে পারদ (Mercury) ও পানি দিয়ে পূর্ণ করলে পারদপূর্ণ পাত্রটি অনেক বেশি ভারী মনে হবে। কেন? কারণ হিসেবে বলা যায়, পানির তুলনায় পারদের ঘনত্ব অনেক বেশি।

ঘনত্ব (Density = d) হচ্ছে বস্তুর একক আয়তনের ভর।
অর্থাৎ ঘনত্ব (d) = (ভর, m)/(আয়তন, v)

দুটো দাঁড়িপাল্লার বাঁ দিকের পাল্লায় রাখা হয়েছে ৫ কেজি করে দুটো বাটখারা। প্রথমটির ডানের পাল্লায় বড় একটি বস্তা, অন্যটির ডান পাল্লায় ছোট একটি বস্তা। দেখো, প্রথম ছবিতে দাঁড়িপাল্লাটি বাঁ দিকে হেলে রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, আকারে বড় হলেই তার ভর বেশি হবে, এমন কোনো কথা নেই। আসলে বড় বস্তায় আছে ৫ কেজি তুলা, আর ছোট বস্তায় আছে ১০ কেজি চাল। এ ক্ষেত্রে কার ঘনত্ব বেশি– চালের, নাকি তুলার?

অনিয়মিত আকৃতির (যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সুনির্দিষ্ট নয়) বস্তুর, যেমন একটি পাথর বা তরলের আয়তন কীভাবে বের করব?

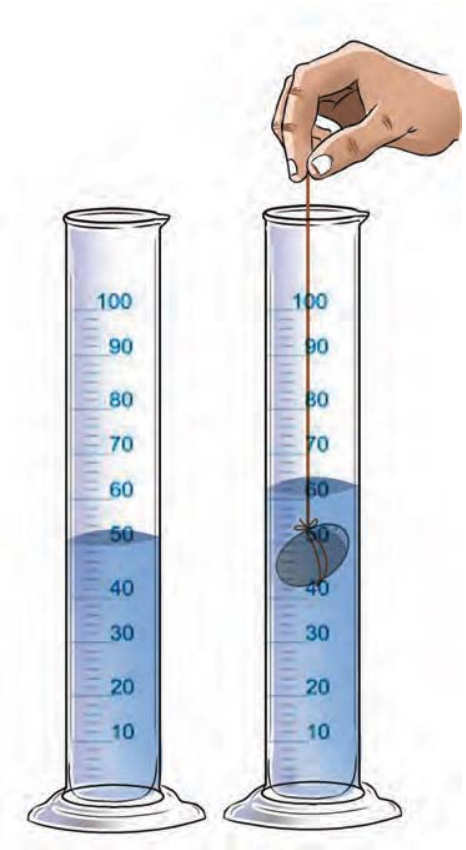

এর জন্য একটি মাপচোঙ (Measuring cylinder) নাও। সেটি ৫০ CC দাগ পর্যন্ত পানি দিয়ে ভর্তি করো। এক টুকরা সুতা দিয়ে বেঁধে পাথরের টুকরাটিকে পানিতে ডুবাও। দেখবে, পানির উচ্চতা কিছুটা বেড়ে গেছে। ধরো, সেই উচ্চতা ৬০ CC।

তাহলে পাথরটির আয়তন (V)

= ৬০ CC – ৫০ CC

= ১০ CC (= ১০ ঘন সে. মি.)

বস্তুটি আকারে বড় হলে মাপচোঙে ঢুকানো যাবে না। সে ক্ষেত্রে অন্য বুদ্ধি কাজে লাগাবে!

পার্শ্বনলযুক্ত বড় একটি পাত্র নিই। নলের নিচে খালি একটি বিকার রাখি। নলযুক্ত পাত্রটি পানি দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করি। পানির উচ্চতা নলের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছার পরে আর ওপরে উঠবে না। অতিরিক্ত পানি পার্শ্বনল দিয়ে বেরিয়ে যাবে। বিকারটি সরিয়ে নিয়ে সেখানে একটি খালি মাপচোঙ রাখি। এবার অনিয়মিত আকৃতির বস্তুটি সুতা দিয়ে বেঁধে আস্তে আস্তে পাত্রের পানিতে ডুবাই। বস্তুটির যা আয়তন, ঠিক ওই আয়তনের পানি পার্শ্বনল দিয়ে মাপচোঙে গিয়ে পড়বে। ওই পানিটুকুর যা আয়তন (মাপচোঙ থেকে পাব), সেটাই বস্তুটির আয়তন।

পানিতে ডুবিয়ে আয়তন পরিমাপের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, বস্তুটি যেন পানিতে গলে না যায়।

তরল পদার্থের আয়তন মাপচোঙের সাহায্যে সরাসরি বের করা যায়।

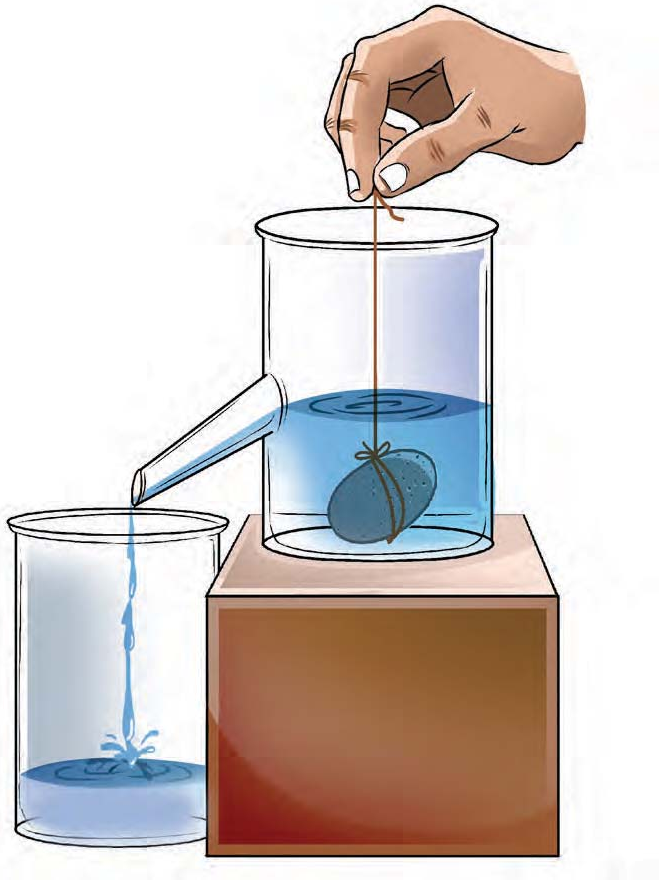

অনুশীলনঃ (নিজে করি)

১) একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য ১০ ডেসি. মি., প্রস্থ ২০ সে. মি. ও উচ্চতা ৫ মি. মি.।
বস্তুটির আয়তন কত?

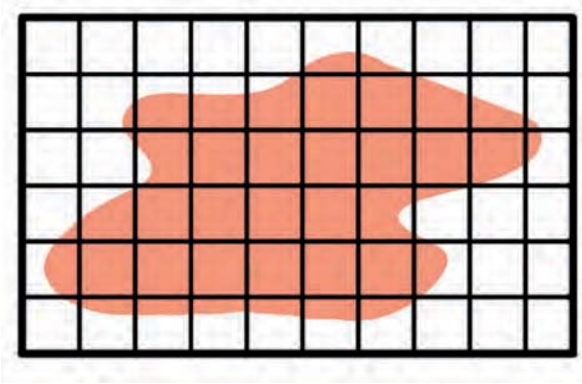

২) চিত্রে প্রতিটি ছোট বর্গক্ষেত্রের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৪ সে. মি. হলে অনিয়মিত ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত?

৩) একটি চিনির কিউবের (ঘন বস্তু আকারের ছোট চিনির টুকরা) আয়তন বের করার উদ্দেশ্যে মাপচোঙের পানিতে ডুবানো হলো। এভাবে কিউবের আয়তন বের করা যাবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৪) আমার পড়ার টেবিলের উপরিতলের ক্ষেত্রফল ১৫০০০ বর্গ সে. মি.। টেবিলের প্রস্থ ১ মি. হলে দৈর্ঘ্য কত?

৫) ১ কেজি লোহা আর ১ কেজি তুলা। কোনটির ওজন বেশি? কোনটির আয়তন বেশি? কেন?

৬) মিটার স্কেল দিয়ে নিচের কোনটি মাপা যায় না?

বোতলের ব্যাস

মানুষের উচ্চতা

টেবিলের প্রস্থ

তারের দৈর্ঘ্য

৭) পাশের চিত্রে দেখানো ঘনবস্তুটির দৈর্ঘ্য=প্রস্থ=উচ্চতা= ৩ সে. মি.। এখান থেকে ১ ঘন সে. মি. আকারের কতগুলো ঘন বস্তু পাওয়া সম্ভব?

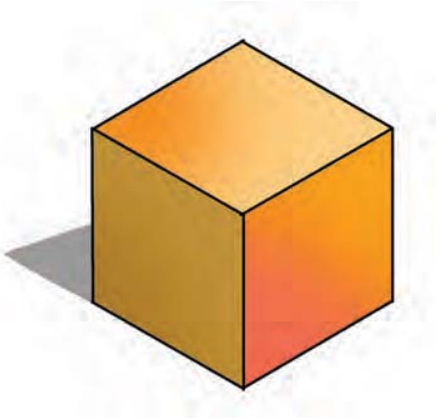

৮) শূন্যস্থান পূরণ করো:

ক) ০.০৫ মিটার = _____ সে. মি.

খ) ৫০ গ্রা = _____ কেজি

গ) ২৫ মি. মি. = _____ কি. মি.

ঘ) ১ কি. মি. = _____ মি. = _____ সে. মি. = _____ মি. মি.

ঙ) _____ কি. মি. = ১ মি. = _____ সে. মি. = _____ মি. মি.

চ) _____ কি. মি. = _____ মি. = ১ সে. মি. = _____ মি. মি.

ছ) _____ কি. মি. = _____ মি. = _____ সে. মি. = ১ মি. মি.

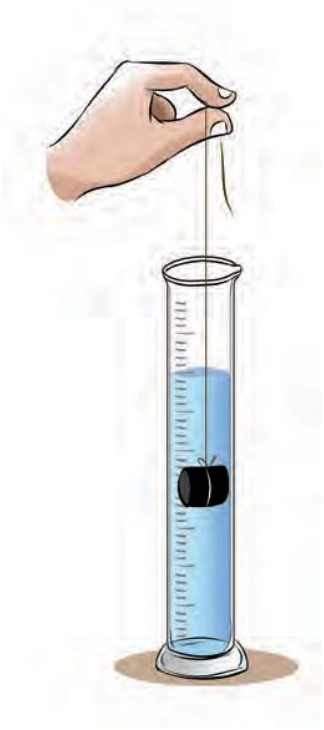

৯) ৫০ cc দাগ পর্যন্ত পানিভর্তি মাপচোঙে ৮ ঘন সে. মি. আয়তনের এক টুকরা লোহা ডুবালে পানির উচ্চতা কোন দাগ পর্যন্ত উঠবে?

১০) পানি ও লোহার ঘনত্ব যথাক্রমে ১ গ্রা/ঘন সে. মি. ও ৮ গ্রা/ঘন সে. মি. হলে লোহা পানির তুলনায় কত গুণ ভারী?

১১) কাচের ঘনত্ব ২.৫ g/cm^3. S.I পদ্ধতিতে এর ঘনত্ব কত?

১২) পেট্রলের ঘনত্ব ৮০০ kg/m^3, ৪০০ kg পেট্রলের আয়তন কত?

১৩) শূন্যস্থান পূরণ করো:

ক) ১ m^3 = _ _ _ _ _ cm^3 = _ _ _ _ _ mm^3

খ) ১ l (Liter) = _ _ _ _ _ ml = _ _ _ _ _ cm^3

গ) ১ cm^3 = _ _ _ _ _ ml = _ _ _ _ _ l (Liter)

১৪) নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে, একটি ঘরের কোথায় কী রাখা হয়েছে। এখানে প্রতিটি ছোট বর্গক্ষেত্রের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫০ সে. মি.। এবার প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ক) ঘরের মেঝের ক্ষেত্রফল (প্রায়) কত?
খ) দেয়াল ক্যাবিনেটের দৈর্ঘ্য (প্রায়) কত?
গ) কর্নার টেবিলের উপরিভাগের ক্ষেত্রফল (প্রায়) কত?
ঘ) সোফাসেটের প্রস্থ (প্রায়) কত?

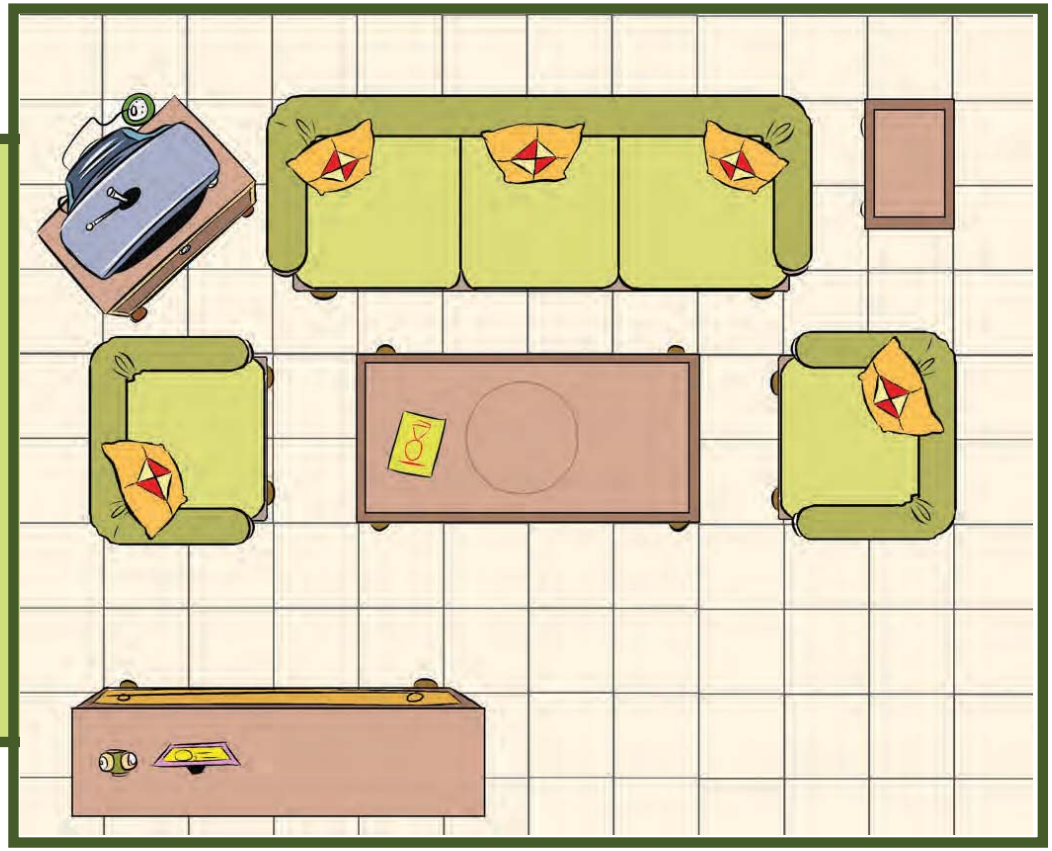

১৫) পাশের চিত্রে দেখানো মাপচোঙের পানির উচ্চতাগুলো লিখে রাখো।
এবার বলো:

ক) লোহার টুকরার আয়তন কত?
খ) ইটের টুকরার আয়তন কত?
গ) মাপচোঙের পানির আয়তন কত?

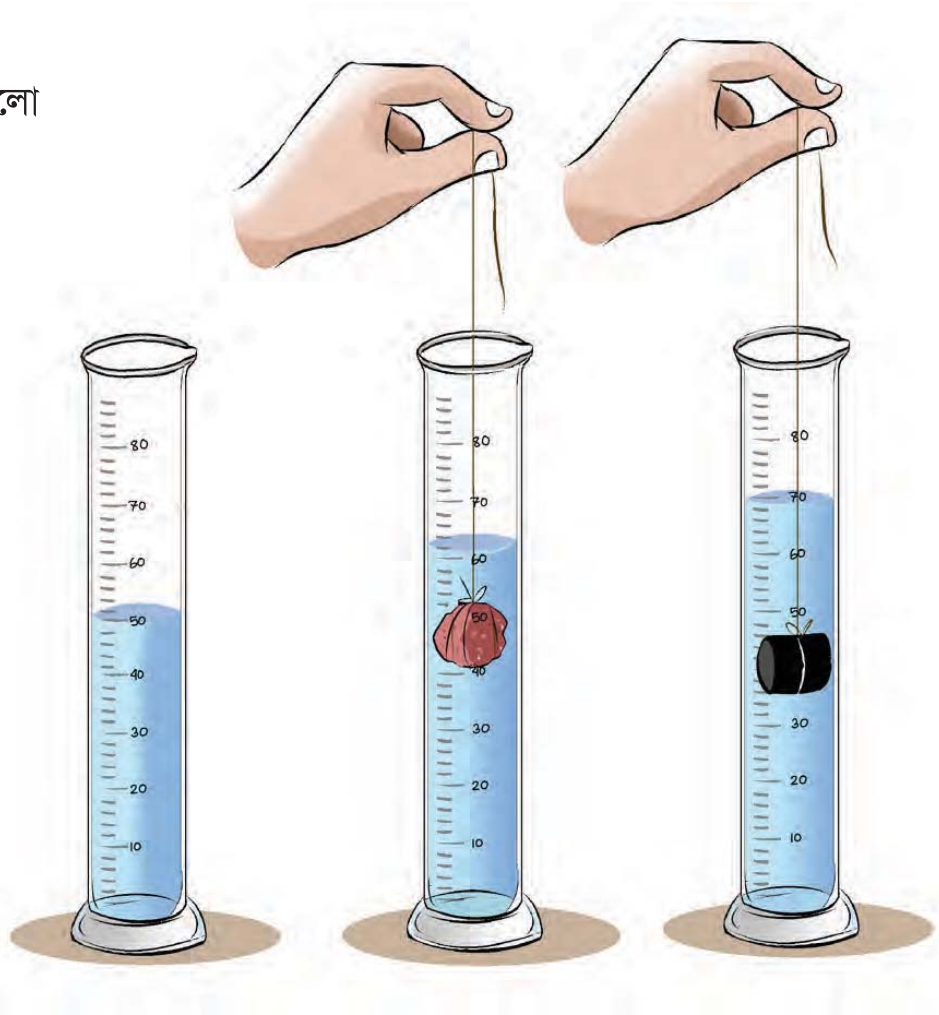

১৬) ৩টি বিকারের প্রথমটিতে সাধারণ তেল (ঘনত্ব = ০.৯ g/cm^3), দ্বিতীয়টিতে পানি (ঘনত্ব = 1g/cm^3) এবং তৃতীয়টিতে গ্লিসারিন (ঘনত্ব = ১.৩ g/cm^3) রাখা আছে। এক টুকরা কর্ক (ঘনত্ব = ০.২৪ g/cm^3), এক টুকরা বরফ (ঘনত্ব = ০.৯২ g/cm^3) এবং এক টুকরা কাচ (ঘনত্ব = ২.৫ g/cm^3). প্রতিটি বিকারে একবার করে ফেলা হলো। কোন বিকারে কোনটা ডুবে যাবে, আর কোনটা ভাসবে?

১৭) মণিদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন এবং তারা মাসে মোট ৩৫০০ লিটার পানি ব্যবহার করে। ফারহানদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১০ জন এবং তারা মোট ৬৫০০ লিটার পানি ব্যবহার করে। এ থেকে কি বলা যাবে যে, মণিদের পরিবারের তুলনায় ফারহানদের পরিবারের পানির ব্যবহার বেশি?

১৮) আমার বেডরুমের একদিকের দেয়ালের দৈর্ঘ্য ৪৫৭ সে. মি. ও উচ্চতা ২৯০ সে. মি.। আমার কাছে ফ্রেমে বাঁধানো ৩টি ছবি আছে: সেগুলোকে ওই দেয়ালে মানানসই করে লাগাতে হবে। মেঝে থেকে ছবিগুলোর উচ্চতা হবে ১৮৩ সে. মি.। ফ্রেমসহ ছবিগুলোর মাপ ১০০ সে. মি. X উচ্চতা ৭০ সে. মি., ৫০ সে. মি. X ৬০ সে. মি. ও ৫০ সে. মি. X উচ্চতা ৬০ সে. মি.। ছবিগুলো লাগানোর পরে প্রতিটি ছবির উভয় পাশে (ডানে ও বাঁয়ে) সমান পরিমাণ জায়গা থাকে।

ক) বড় ছবিটি সিলিং থেকে কত নিচে থাকবে?
খ) বড় ছবিটি মাঝে রাখলে তা থেকে ছোট ছবিগুলোর দূরত্ব কত হবে?
গ) ছবিগুলোর নিচের দিকটা সিলিং (ceiling) থেকে কত নিচে থাকবে?

১৯) ষষ্ঠ শ্রেণির কক্ষের ক্ষেত্রফল ৬৬০ বর্গ সে. মি.। বোর্ডের দিকে টিচারের চেয়ার-টেবিলের জন্য ৩০০ বর্গ সে. মি. জায়গা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট জায়গায় দুই সারিতে ৪টি করে মোট ৮টি বেঞ্চ বসানো আছে। ছাত্রসংখ্যা ৪০ জন হওয়ায় ছাত্রদের বেশ অসুবিধা হয়। এই কক্ষে আর কোনো বেঞ্চ বসানোর জায়গা নেই। নবম শ্রেণির কক্ষটা দৈর্ঘ্যে আরও একটু বড়; তাই সেখানে মোট ১০টি বেঞ্চ বসানো গেছে। অথচ ওই শ্রেণির ছাত্রসংখ্যা ৩০ জন।
এমতাবস্থায়,

ক) ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্ররা প্রতি বেঞ্চে কতজন করে বসবে?
খ) নবম শ্রেণির ছাত্ররা প্রতি বেঞ্চে কতজন করে বসবে?
গ) শিক্ষকের চেয়ার-টেবিলের জায়গাসহ নবম শ্রেণির ক্ষেত্রফল কত?

২০) ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র পিয়াল, দৈনিক সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় পড়তে বসে। নিজস্ব পড়া ও স্কুলের হোমওয়ার্ক করে রাত ১০টার দিকে খাওয়া-দাওয়া করে। রাত ১১টার পরে ঘুমাতে যায়। কিন্তু আজকে রাত নয়টা পাঁচ মিনিট থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত টিভিতে একটা মজার অনুষ্ঠান আছে, যেটা তাকে দেখতেই হবে। এদিকে স্কুলের হোমওয়ার্কও করতে হবে।

কীভাবে পরিকল্পনা করলে তার সব কাজ (পড়া, হোমওয়ার্ক করা, টিভি দেখা, খাওয়া, ঘুমাতে যাওয়া) মোটামুটি ঠিকভাবে হতে পারে?

চিন্তার খোরাক

১) বাঁশের খুঁটি বা ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য বের করা সহজ। কিন্তু যদি গভীর সমুদ্রের গভীরতা বা পৃথিবীর ব্যাসার্ধ মাপার প্রশ্ন আসে, তাহলে কীভাবে মাপা যেতে পারে?

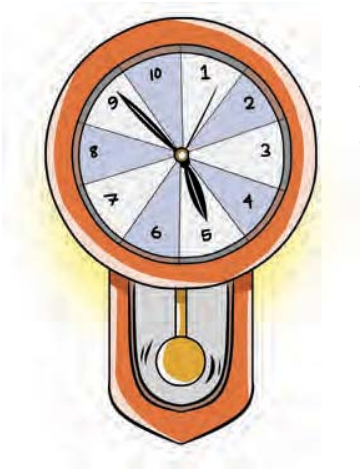

২) ১৭৯২ সালে মেট্রিক পদ্ধতি চালু হওয়ার পর ঘড়িগুলোও ১২ ঘণ্টার পরিবর্তে ১০ ঘণ্টায় করার প্রস্তাব এসেছিল। যা হোক, শেষ পর্যন্ত তা গৃহীত হয়নি। যদি তা গ্রহণ করা হতো, তাহলে সময়ের পরিমাপে কী কী সুবিধা বা অসুবিধার সৃষ্টি হতো?

৩) ২০ তলা উঁচু একটি বিল্ডিং। তার চারপাশ ফাঁকা। বিল্ডিংয়ে না উঠে তার উচ্চতা পরিমাপ করা সম্ভব কি?

৪) পুরো এক চক্কর ঘুরলে ছোট চাকার তুলনায় বড় চাকা বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে। গাড়ির চাকাগুলো আরও অনেক বড় হলে গাড়ির গতি কি অনেক বেশি হতো না?

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদার্থ (MATTER)

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদার্থ (MATTER)

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১। পদার্থ কী, তা বলতে পারব।
২। মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের পার্থক্য করতে পারব।
৩। পদার্থের প্রতীক ব্যবহারের কারণ বলতে পারব।
৪। পদার্থের বিভিন্ন অবস্থায় এর অণুসমূহের বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারব।
৫। পদার্থের বিভিন্ন অবস্থার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
৬। ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের পার্থক্য করতে পারব।
৭। একাধিক পদার্থের মিশ্রণ থেকে কতিপয় পদ্ধতি ব্যবহার করে পদার্থগুলোকে আলাদা করতে পারব।

এ অধ্যায়ে কী শিখব

i) পদার্থের ধারণা ii) মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ iii) পদার্থের প্রতীক iv) পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য v) ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন vi) মিশ্রণ থেকে উপাদানসমূহ পৃথকীকরণ

পদার্থের ধারণা

আমাদের আশপাশে যা কিছু দেখি, সেগুলো সবই বিভিন্ন পদার্থের তৈরি। যেমন: চেয়ার, টেবিল (কাঠের তৈরি), জগ, মগ (প্লাস্টিক বা কাচের তৈরি), টব (মাটির তৈরি), বল (রাবার বা চামড়ার তৈরি) ইত্যাদি।

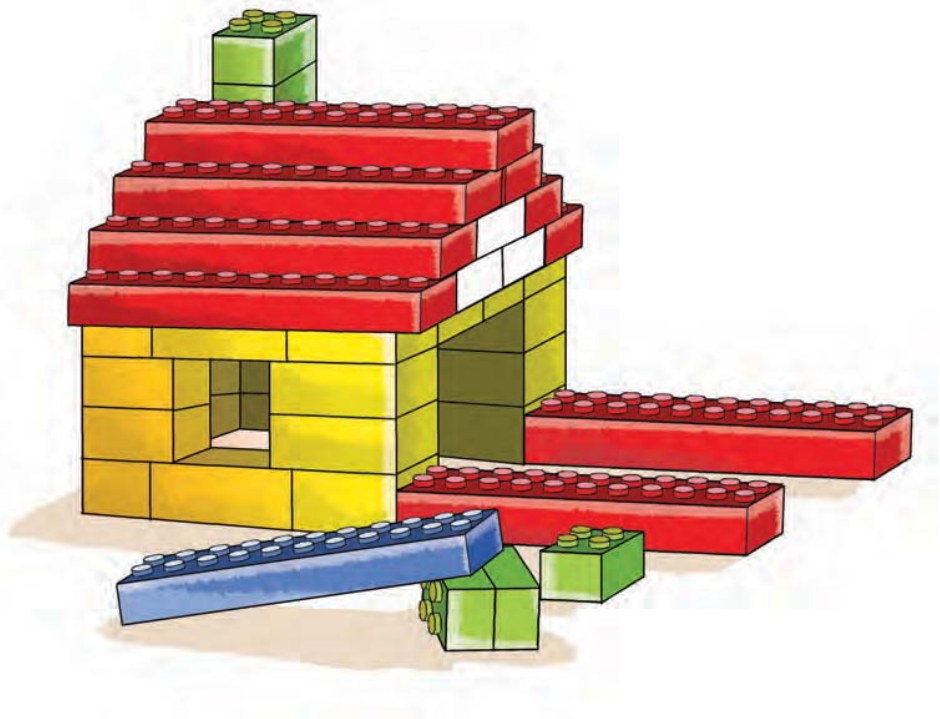

কিন্তু এই পদার্থ বলতে কী বুঝব? বিল্ডিং ব্লক (Building block) দিয়ে তৈরি পাশের চিত্রের মডেলটি দেখো। এটাকে ভেঙে টুকরা টুকরা করলে সবচেয়ে ছোট টুকরা হিসেবে পাব এক একটি বিল্ডিং ব্লক।

এভাবে যেকোনো বস্তুকে ছোট ছোট টুকরায় বিভক্ত করা যায়। যেকোনো পদার্থের ক্ষেত্রে এ রকম সবচেয়ে ছোট যে টুকরা, যার মধ্যে পদার্থের সব বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে, তাকে আমরা বলি অণু। অণুকে ভাঙলে কী পাব? আরও ছোট একধরনের কণা, যাকে আমরা বলি পরমাণু।

একটি পানির অণু আর একটি অক্সিজেনের অণু ভাঙলে আমরা দুই ধরনের ব্যাপার দেখব। দুটি অক্সিজেনের পরমাণু মিলে হয় একটি অক্সিজেনের অণু। কিন্তু পানির অণুর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হবে অন্য রকম। একটি পানির অণু ভাঙলে আমরা পাব তিনটি পরমাণু, যার মধ্যে একটি অক্সিজেন আর দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু! এমন কেন হয় বলো তো?

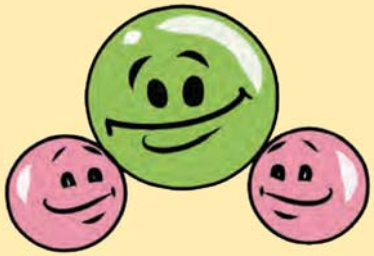

আসলে পৃথিবীর সব পদার্থকে আমরা মোটা দাগে দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। এক ভাগ হচ্ছে এই অক্সিজেনের মতো, যাদের যতই ছোট করা হোক, ওই পদার্থ ছাড়া আর কোনো পদার্থ পাওয়া যাবে না। এদেরকে আমরা বলি মৌলিক পদার্থ। যেমন– লোহা, হাইড্রোজেন ইত্যাদি।

আরেক ভাগ হলো যৌগিক পদার্থ। এদের ভাঙলে একাধিক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। একাধিক মৌলিক পদার্থ যোগ করে এই ধরনের পদার্থ পাওয়া যায় বলে এদেরকে আমরা বলি যৌগিক পদার্থ। যেমন– পানি, লবণ, চিনি ইত্যাদি।

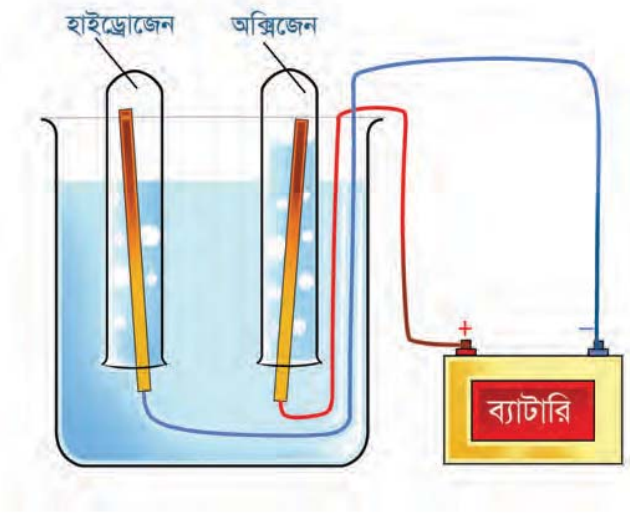

এক টুকরা লোহাকে যত ছোট টুকরা করা হোক না কেন, তার মধ্যে লোহার সম্পূর্ণ গুণাগুণ বিদ্যমান থাকবে। তাই লোহা একটি মৌলিক পদার্থ। পক্ষান্তরে, পানিকে তো আর ভাঙা যাবে না (যেহেতু তরল পদার্থ), তাই সেটাকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে শেষ পর্যন্ত আর কোনো পানি থাকবে না; পাব দুই রকমের বায়বীয় পদার্থের পরমাণু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। এই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মৌলিক পদার্থ আর পানিকে বলব যৌগিক পদার্থ।

চায়ের কাপে অনেক সময় গুঁড়া চিনির পরিবর্তে চিনির কিউব ব্যবহার করা হয়। হাজার হাজার চিনির দানা দিয়ে এক একটি কিউব তৈরি। প্রতিটি চিনির দানায় এত বেশিসংখ্যক কণিকা বা অণু রয়েছে যে, সেটা লিখে প্রকাশ করা গেলেও মুখে বলতে অসুবিধা। যেমন: ১ দানা চিনিতে রয়েছে ৫ x $১০^{১৯}$ বা ৫০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০টি কণিকা।

প্রতিটি মৌলিক পদার্থেরই একটি নাম ও রাসায়নিক প্রতীকচিহ্ন রয়েছে। এই প্রতীকচিহ্নগুলো হচ্ছে নামের লিখিত রূপের সংক্ষিপ্ত রূপ, যা পৃথিবীর সর্বত্র একই। যেমন:

	রাসায়নিক প্রতীক
হাইড্রোজেন	H
ক্যালসিয়াম	Ca
ক্লোরিন	Cl
লোহা	Fe
সিসা	Pb
সোডিয়াম	Na
হিলিয়াম	He

প্রভৃতি

যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলোকে সহজে পৃথক করা যায় না। এ ক্ষেত্রে নতুন পদার্থের সৃষ্টি হয় বলে উপাদানগুলোর আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে না। যেমন: লোহায় যখন মরিচা পড়ে, তখন লোহা (Fe) ও অক্সিজেনের (O) সমন্বয়ে নতুন একটি পদার্থ মরিচা (ফেরিক অক্সাইড Fe_2O_3) তৈরি হয়। এই মরিচা থেকে লোহা ও অক্সিজেন সহজে পৃথক করা যাবে না। অর্থাৎ, মরিচা পড়া একটি রাসায়নিক পরিবর্তন। পানি, খাদ্য লবণ এগুলোও যৌগিক পদার্থ।

হাইড্রোজেন + অক্সিজেন ⟶ পানি

সোডিয়াম + ক্লোরিন ⟶ খাদ্য লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড)

পদার্থের মধ্যে অণুগুলো কীভাবে বিন্যস্ত থাকে, তারই উপর নির্ভর করে পদার্থটি কঠিন, নাকি তরল, নাকি বায়বীয় হবে। বস্তু বা পদার্থ এই তিনটি অবস্থাতেই মূলত থাকতে পারে। ভূগর্ভে প্রাপ্ত বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে মুল্যবান বিভিন্ন পাথরও রয়েছে; হীরা, চুনি, পান্না প্রভৃতি, যেগুলো প্রধানত অলংকার তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

কঠিন পদার্থের অণুসমূহের বিন্যাস

এমন কোনো সিনেমা হলে বসে কি সিনেমা দেখেছ, যেখানে একটি সিটও খালি নেই, যাকে বলে 'হাউসফুল'? লক্ষ করলে দেখবে, সিটগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা লাগিয়ে সারিবদ্ধভাবে বসানো হয়েছে। তোমার সিট থেকে উঠে অন্য কোথাও বসার সিট পাবে না; নিজের সিট থেকে কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হওয়াও কঠিন।

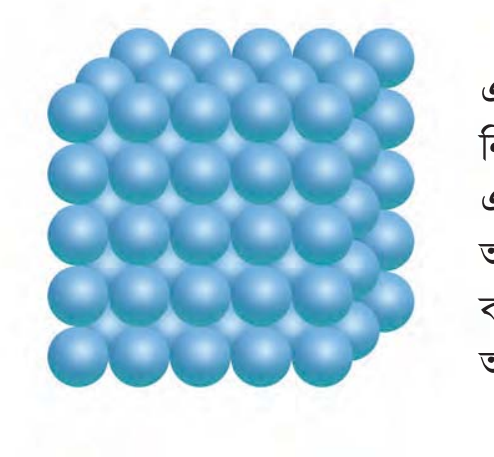

এই একই ধরনের অবস্থা কঠিন পদার্থের অণুগুলোর বিন্যাসের ক্ষেত্রে। অণুগুলো নির্দিষ্ট নিয়মে সারিবদ্ধভাবে গায়ে গায়ে লাগিয়ে সাজানো থাকে, এবং সেগুলো স্বাধীনভাবে এদিক-ওদিক যেতে পারে না। অণুগুলো পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং কঠিন পদার্থের অণুগুলো গায়ে গায়ে লাগানো থাকে বলে তাদের মধ্যে শক্তিশালী আকর্ষণী বল কাজ করে। তাই কঠিন পদার্থকে ভাঙতে যথেষ্ট বল প্রয়োগ করতে হয়। এদের একটা নির্দিষ্ট আকৃতি (Shape), আকার (Size) ও আয়তন (Volume) থাকে।

তরল পদার্থের অণুসমূহের বিন্যাস

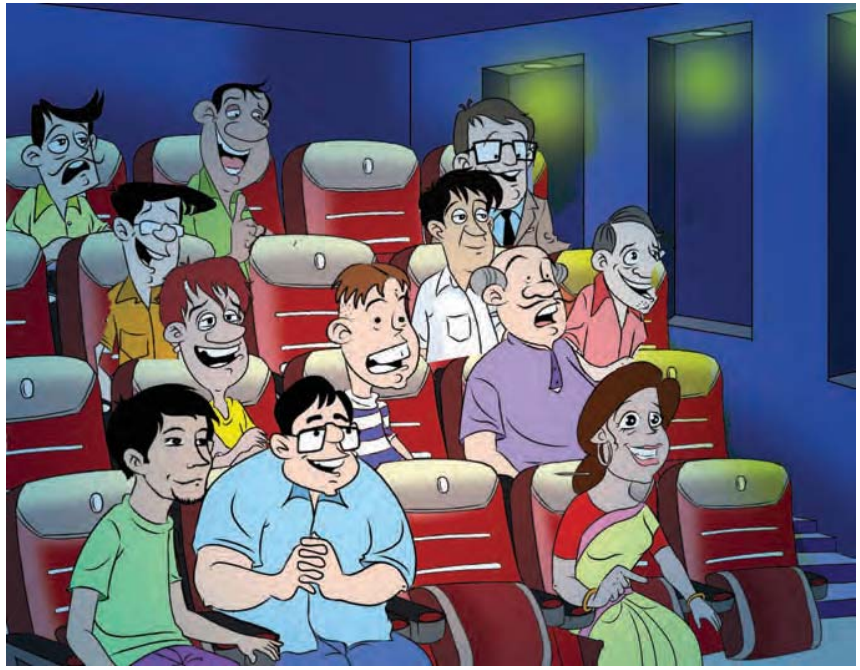

আবারও সেই সিনেমা হলের কথা স্মরণ করো; তবে এবারে হলের ভেতরে বেশ কিছুসংখ্যক সিট ফাঁকা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তুমি বা অন্য কেউ নিজ সিট ছেড়ে উঠে গিয়ে অন্য ফাঁকা সিটে বসতে পারে; অর্থাৎ, এদিক-ওদিক যাওয়ার কিছুটা ব্যবস্থা রয়েছে।

একই ব্যাপার ঘটে তরল পদার্থের অণুগুলোর বিন্যাসের ক্ষেত্রে। এখানে নির্দিষ্ট কোন সারি থাকে না এবং অণুগুলোর মধ্যে বেশ কিছুটা ফাঁকা জায়গা থাকে বলে অণুগুলো ধীর গতিতে হলেও তরলের মধ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে। অণুগুলোর মধ্যে বেশ কিছুটা দূরত্ব থাকে- তাই অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণী বল কঠিন পদার্থের অণুগুলোর আকর্ষণী বলের তুলনায় অনেক কম। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে না হলেও অণুগুলো নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে এদিক ওদিক স্থানান্তরিত হতে পারে। তাই তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আকৃতি (Shape) নেই। তবে নির্দিষ্ট আয়তন (Volume) আছে।

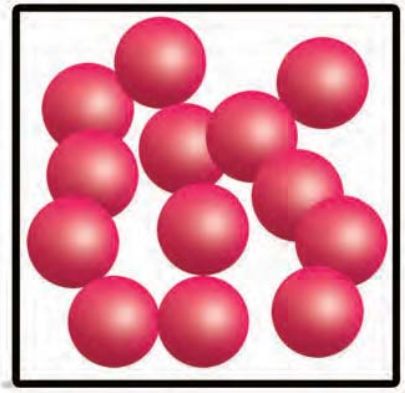

বায়বীয় পদার্থের অণুসমূহের বিন্যাস

আবারও সেই সিনেমা হলের কথা ভাবো, যেখানে তোমরা মাত্র কয়েকজন বসে আছ, আর অন্য সব সিট ফাঁকা। এ ক্ষেত্রে তোমরা ইচ্ছামতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যেকোনো সিটে বসতে পারো। স্থান পরিবর্তন করতে কোনো অসুবিধাও হয় না।

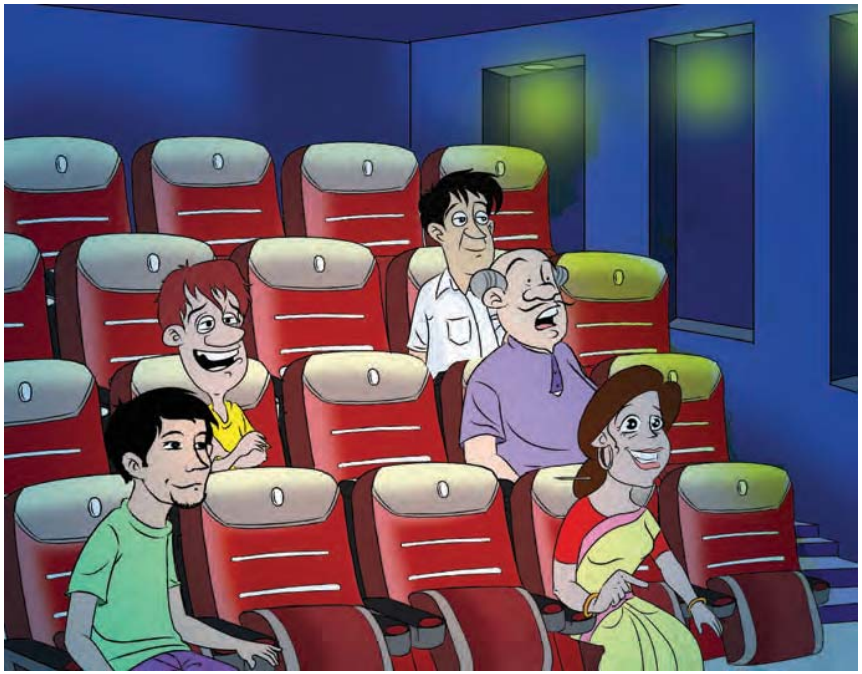

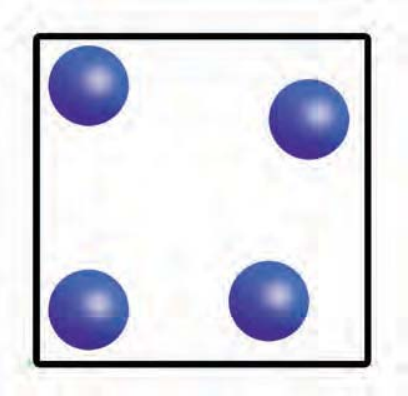

এই একই ধরনের পরিস্থিতি দেখা যায় বায়বীয় পদার্থের অণুগুলোর ক্ষেত্রে। বায়বীয় পদার্থে অণুগুলো স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়; অণুগুলোর মধ্যে দূরত্বও অনেক বেশি থাকে। বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে অণুগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এত দূরে দূরে অবস্থান করে যে, তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণী বল খুবই কম; নেই বললেই চলে। অণুগুলো স্বাধীনভাবে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চলে যেতে পারে।

তাপ প্রয়োগ করে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যায়। যেমন:

কঠিন ⟶ (তাপ প্রয়োগ) তরল ⟶ (তাপ প্রয়োগ) বায়বীয়

কঠিন ⟵ (ঠাণ্ডা করা) তরল ⟵ (ঠাণ্ডা করা) বায়বীয়

যেমন পানির ক্ষেত্রে:

বরফ ⟶ (তাপ প্রয়োগ) পানি ⟶ (তাপ প্রয়োগ) বাষ্প

বরফ ⟵ (ঠাণ্ডা করা) পানি ⟵ (ঠাণ্ডা করা) বাষ্প

এ ক্ষেত্রে প্রথমটিকে সোজা পরিবর্তন বললে পরেরটিকে বলব উল্টা পরিবর্তন (Reversible Change)

উল্লেখ্য: কোনো তরলকে ঠাণ্ডা করে কঠিন পদার্থে পরিণত করলে তার আয়তন একটু কমে যায়, কিন্তু পানির ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম। পানি বরফে পরিণত হলে আয়তন বেড়ে যায়, অর্থাৎ ঘনত্ব কমে যায়, তাই বরফ পানিতে ভাসে।

বায়বীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য

চিড়িয়াখানায় রাতের বেলায় বানরগুলোকে ছোট একটা খাঁচায় রাখা হয়। সকালে দরজা খুলে দিলে তারা খোলামেলা প্রশস্ত জায়গায় বেরিয়ে পড়ে এবং পুরো জায়গাটায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে।

এই একই ব্যাপার ঘটে বায়বীয় পদার্থের ক্ষেত্রে। আবদ্ধ ছোট পাত্রে রাখলে বায়বীয় পদার্থ ওই পাত্রের সবটুকু জায়গাজুড়ে থাকে, আবার আবদ্ধ বড় পাত্রে রাখলেও বায়বীয় পদার্থ ওই পাত্রের সবটুকু দখল করে থাকে। এ ক্ষেত্রে অণুগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব বেড়ে যায়। তাই বায়বীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি বা আয়তন নেই। সুগন্ধির একটি বোতল মুখ খুলে ঘরের এক কোনায় রেখে দিলে পুরো ঘরটাই একসময় সুগন্ধে ভরে যাবে। আসলে তরল সুগন্ধি গ্যাসে পরিণত হওয়ার পর অণুগুলো সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ে।

অনেক বায়বীয় পদার্থ পানিতে দ্রবীভূত হয়। যেমন: পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন দিয়েই জলজ প্রাণী শ্বাসকার্য চালায়।

বাজারে নানা রকম কোমল পানীয় (Cold Drinks) পাওয়া যায়, যেগুলো পান করলেও ঢেঁকুর ওঠে। এগুলোকে অনেকে সোডা ওয়াটার বলেও চেনে। ওই পানীয়তে মূলত কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাসকে চাপ দিয়ে তরলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। ওই দ্রবীভূত গ্যাসের কারণেই ঢেঁকুর ওঠে।

কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	কঠিন পদার্থ	তরল পদার্থ	বায়বীয় পদার্থ
আয়তন	অপরিবর্তনশীল	অপরিবর্তনশীল	পরিবর্তনশীল ও পুরো পাত্রজুড়ে থাকে
আকৃতি	অপরিবর্তনশীল	পাত্রের আকৃতি ধারণ করে	পাত্রের আকৃতি ধারণ করে
ঘনত্ব	উচ্চ	মধ্যম	কম
প্রবাহ	প্রবাহিত হয় না	সহজে প্রবাহিত হয়	সহজে প্রবাহিত হয়
তাপে প্রসারণ	কম	মধ্যম	উচ্চ

ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন

কখনো চাপাতি রুটি খেয়েছ? এটা দেখতে একটি বস্তু হলেও এর মধ্যে তিন রকম পদার্থ রয়েছে: পানি, আটা ও লবণ।

পানি একটি তরল পদার্থ। এর নির্দিষ্ট আয়তন আছে, তবে নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই। এর কোনো গন্ধ নেই এবং এটা স্বচ্ছ (এর মধ্য দিয়ে দেখা যায়)। এগুলো পানির কিছু বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম। তেমনিভাবে, আটা ও লবণের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে পারো কি?

পানি, আটা ও লবণ মিশিয়ে একটি মণ্ড তৈরি করা হয়। পানি সেটাকে ভেজা ভেজা করে, আর লবণ সেটাকে লবণাক্ত করে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই মণ্ডের মধ্যে পানি কি তরল ও স্বচ্ছ অবস্থায় আছে? লবণের সাদা গুঁড়া কি তাতে দেখা যায়?

আসলে পদার্থ তিনটি পরস্পরের ওপর কিছু প্রতিক্রিয়া করেছে; তারই ফলে মণ্ড তৈরি হয়েছে, যা থেকে পানি, আটা ও লবণ আলাদা করা কঠিন। কিন্তু এদের প্রত্যেকের কিছু বৈশিষ্ট্য এই মণ্ডের মধ্যে পাওয়া যাবে।

এখানে পদার্থ তিনটির মিশ্রণের ফলে যেই পরিবর্তন আমরা দেখি, তা হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন। অন্যদিকে একাধিক পদার্থ পরস্পরের সঙ্গে মিশে যখন ভিন্ন রাসায়নিক ধর্মের পদার্থ সৃষ্টি করে, তখন আমরা তাকে বলি রাসায়নিক পরিবর্তন।

যেমন– খাদ্য লবণ (রসায়ন শাস্ত্রে বলে সোডিয়াম ক্লোরাইড, NaCl) বা তুঁতে (রসায়নে কপার সালফেট, $CuSO_4$), এগুলো তৈরি হয় যথাক্রমে সোডিয়াম ও ক্লোরিন এবং কপার, সালফার ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে।

সোডিয়াম + ক্লোরিন ⟶ খাদ্য লবণ

কপার + সালফার + অক্সিজেন ⟶ তুঁতে

এগুলোতে সোডিয়াম, ক্লোরিন, কপার, সালফার বা অক্সিজেনের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ছোট একটি প্লেটে কয়েক টুকরা বরফ নাও। কক্ষ তাপমাত্রায় কিছুক্ষণ রেখে দেওয়ার পরে খেয়াল করে দেখো, কিছুটা বরফ গলে গিয়ে প্লেটে পানি জমা হয়েছে। এখানে বরফ ও পানি কিন্তু একই পদার্থ, কেবল অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এটাকে বলে ভৌত পরিবর্তন (Physical Change)। এখানে নতুন কোনো পদার্থের সৃষ্টি হয় না, কেবল অবস্থার পরিবর্তন হয়।

এবার এক টুকরা কাগজ বা কাঠ পোড়াও। শেষ পর্যন্ত কী পাবে? ছাই। এই ছাই কিন্তু একটি ভিন্ন পদার্থ। এর ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য কাগজ বা কাঠের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। শত চেষ্টা করেও এই ছাই থেকে কাগজ বা কাঠ ফেরত পাওয়া সম্ভব নয়। এই পরিবর্তন হচ্ছে রাসায়নিক পরিবর্তন (Chemical Change)।

মিশ্রণের উপাদানসমূহ পৃথক্‌করণ

মিশ্রণের উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উপাদানগুলো পৃথক করা হয়। যেমন:

ক) একটি পাত্রের পানিতে বালি মিশিয়ে নাড়াচাড়া করার পর ওই বালি পৃথক করার বুদ্ধি কী? খুব সোজা। পাত্রটিকে চুপচাপ কিছুক্ষণ রেখে দাও। দেখবে বালির কণাগুলো সব পাত্রের তলায় জমা হয়েছে। এভাবে তরলে অদ্রবীভূত কঠিন ভারী বস্তু তরলের মধ্যে পাত্রের তলায় জমা হওয়াকে বলে থিতানো (Sedimentation)।

এই প্রক্রিয়ার আরেকটি উদাহরণ দিতে পারো কি?

খ) গন্ধকের গুঁড়ার সঙ্গে লোহার গুঁড়া মিশে গেছে। এগুলোকে পৃথক করবে কী করে? এক টুকরা চুম্বক ওই মিশ্রণের মধ্যে নাড়াচাড়া করলে লোহার গুঁড়াগুলো তার সঙ্গে আটকে গিয়ে বের হয়ে আসবে। নিকেল (Ni) এবং কোবাল্টকেও (Co) চুম্বক এভাবে আকর্ষণ করে।

কিছুসংখ্যক আলপিন ও সুচ একসঙ্গে মেশানো থাকলে এ প্রক্রিয়ায় তাদের পৃথক করা যাবে কি? কেন?

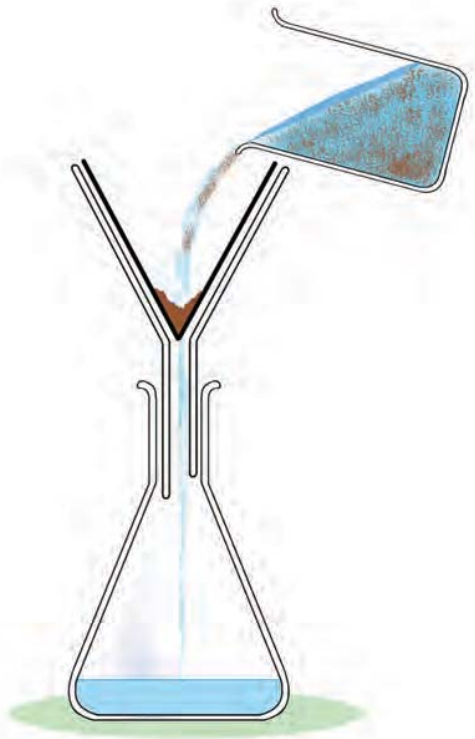

গ) বালিমিশ্রিত পানি ছাঁকন কাগজের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে কাগজের ওপরে বালির কণাগুলো আটকে থাকবে। এই পদ্ধতিকে বলে ছাঁকন বা পরিস্রাবণ (Filtration)। এই প্রক্রিয়ার আরেকটি উদাহরণ দাও।

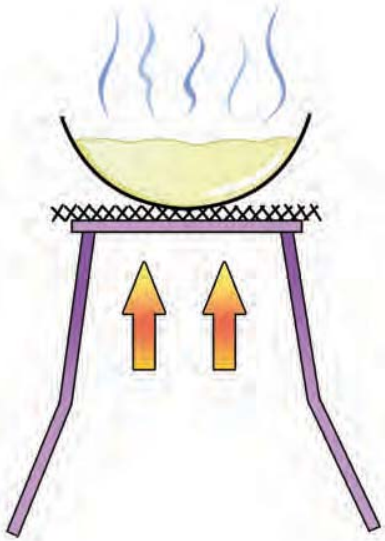

ঘ) বেশি পরিমাণে লবণ মেশানো পানি বা সমুদ্রের লবণাক্ত পানি পানযোগ্য নয়। এখান থেকে লবণ পৃথক করতে হলে তাপ প্রয়োগ করে পানি সবটুকু বাষ্পে পরিণত করে দিলেই পাত্রের তলায় লবণ পড়ে থাকবে। তরলের এই বাষ্পে পরিণত করাকে বলে বাষ্পীকরণ (Evaporation)। চিনির শরবত থেকে এভাবে চিনি বের করা সম্ভব কি?

এই প্রক্রিয়াগুলো ছাড়া আরও কিছু প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যেমন–

ঙ) বালি মিশ্রিত পানি কিছুক্ষণ রেখে দিলে পাত্রের তলায় বালি জমা হওয়ার পর ওপরের স্বচ্ছ পানিটুকু আমরা সাবধানে অন্য পাত্রে ঢেলে নিতে পারি। একে বলে আস্রাবণ (Decantation)।

ভোজ্য তেলে পানি মিশে গেলেও এ প্রক্রিয়ায় তেল আলাদা করা সম্ভব।

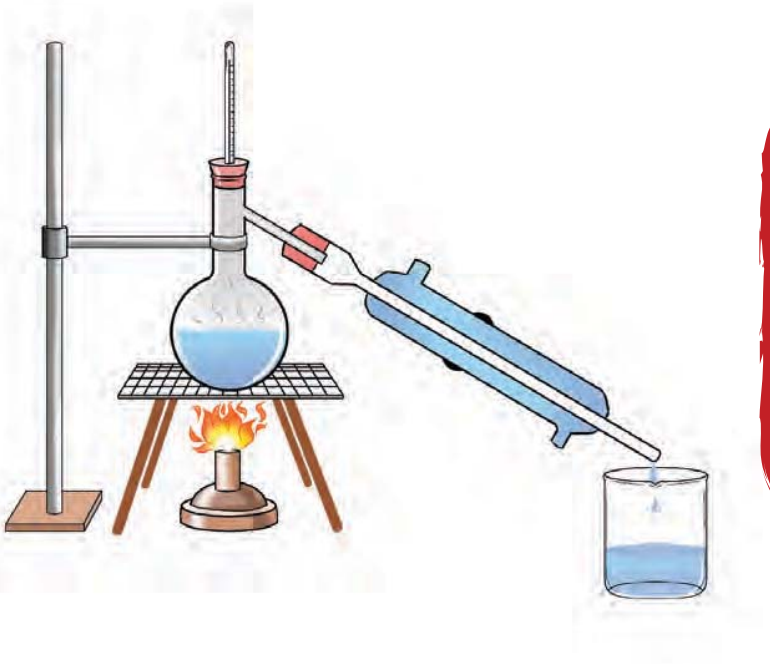

ছ) লবণ মিশ্রিত পানিতে তাপ দিতে থাকলে পানি বাষ্পে পরিণত হবে। ওই বাষ্পকে যদি বাতাসে মিশে যেতে না দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়, তাহলে আবার আমরা স্বচ্ছ পানি ফিরে পাব, যাতে কোনো লবণ থাকবে না। এই প্রক্রিয়াকে বলে পাতন (Distillation)

এসব প্রক্রিয়া আমাদের জীবনে বহু কাজে লাগে। ধরো, ১ কেজি চিনিতে ৫০ গ্রাম বালি মিশে গেল। ওই চিনিটুকু কাজে লাগানোর উপায় কী? পানি মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করো; তাতে চিনি গলে গেলেও বালি গলবে না। এবার ছাঁকন বা থিতানো ও আস্রাবণ প্রক্রিয়ায় চিনির দ্রবণ পৃথক করে নিয়ে বাষ্পীকরণ করো। দেখবে, পাত্রের তলায় চিনি গলিত অবস্থায় পড়ে আছে। সেটা চিনি হিসেবে কাজে লাগানো যাবে।

আবার ধরো, ১ কেজি আটার মধ্যে কিছু লোহার গুঁড়া হঠাৎ করে মিশে গেল। ওই আটা দিয়ে কোনো খাদ্য প্রস্তুত করা যাবে না। এখন উপায়? এক টুকরা চুম্বক নিয়ে আটার মধ্যে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করো, দেখবে লোহার গুঁড়াগুলো চুম্বকের সঙ্গে বের হয়ে এসেছে। এভাবে কয়েকবার করলে আটা সম্পূর্ণভাবে লোহার গুঁড়ামুক্ত হবে।

ঘনীভবন ও বাষ্পীভবন:

চ) ডিপ ফ্রিজে এক বাটি পানি রেখে দাও। একসময় দেখবে বাটির পানি পুরোটা বরফ হয়ে গেছে। তরলকে ঠাণ্ডা করে এভাবে কঠিন পদার্থে অথবা বায়বীয় পদার্থকে তরলে পরিণত করাকে বলে ঘনীভবন (Condensation)।

সাগরের পানি বাষ্পীভূত হয়ে ওপরে উঠে গিয়ে এই ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় পানির ফোঁটায় রূপান্তরিত হয়ে বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে নেমে আসে।

এর আগে আমরা বাষ্পীকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে জেনেছি। কিন্তু বাহ্যিকভাবে তাপ প্রয়োগ ছাড়াও প্রাকৃতিকভাবে সূর্যের তাপে পানি বাষ্পীভূত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, ভেজা কাপড় রোদে রাখলে তা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়; এই প্রক্রিয়াই বাষ্পীভবন।

সাগরের পানি থেকে প্রাকৃতিকভাবে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় খাদ্য লবণ তৈরি করা হয়। ধানের চারা লাগানোর মতো একটি বেড (Bed) তৈরি করে তাতে বিরাট একটা পলিথিন বিছিয়ে দেওয়া হয়। একটা নালার মতো পথ দিয়ে সাগরের নোনা পানি ছাঁকনির মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার করে ওই বেডে নিয়ে আসা হয়। চারদিকে বাঁধ দেওয়া থাকে বলে বাইরে থেকে কোনো পানি এখানে আসতে পারে না। রোদের তাপে ওই পানি বাষ্পীভূত হয়ে গেলে পলিথিনের ওপরে ভেজা ভেজা লবণ জমে থাকে।

পানীয় জলের অভাব হলে অনেক সময় সাগরের লবণাক্ত পানি থেকে লবণ বের করে দিতে হয়। সেটা কীভাবে সম্ভব?

ছাঁকন প্রক্রিয়ায় সাগরের পানি থেকে অন্যান্য অদ্রবীভূত ময়লা দূর করে পরিস্রুত লবণাক্ত পানিকে পাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানিতে পরিণত করা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে পাত্রের তলায় উপজাত (By Product) হিসেবে লবণ পাওয়া যাবে। জাহাজের নাবিকেরা পানিকে এভাবে পরিশোধন করে পানীয় জলের ঘাটতি মিটিয়ে থাকেন।

অনুশীলন: (নিজে করি)

১) নিচের প্রতিটির দুটো করে উদাহরণ দাও:

ক) কঠিন পদার্থ

খ) তরল পদার্থ

গ) বায়বীয় পদার্থ

২) পানি কী কী অবস্থায় থাকতে পারে?

৩) পানির কয়েকটি ভৌত ধর্ম উল্লেখ করো।

৪) ভৌত পরিবর্তন ও রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য কী?

৫) সকল পদার্থের স্বাদ আমরা গ্রহণ করতে পারি না কেন? কমপক্ষে দুটো কারণ দেখাও।

৬) সঠিক শব্দটি বৃত্ত বা উপবৃত্ত (◯ বা ⬭) দ্বারা আবদ্ধ করো:

ক) পৃথিবীপৃষ্ঠে খুব কম পদার্থ আছে যা বিশুদ্ধ/বিশুদ্ধ নয়।

খ) চিনি হচ্ছে দ্রব/দ্রাবক।

গ) তরলে অদ্রবীভূত কঠিন পদার্থ আলাদা করার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে ছাঁকন কাগজ/কাপড় ব্যবহার।

ঘ) পৃথিবীর সকল বস্তুই অণু দিয়ে/পাথর দিয়ে/দ্রাবক দিয়ে তৈরি।

ঙ) পানির নির্দিষ্ট আয়তন/আকার/স্বাদ আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট আয়তন/আকার নেই।

চ) পানিতে মিশ্রিত কাদা আলাদা করা যায় বাষ্পীকরণ/কম্পন/উত্তপ্তকরণের সাহায্যে।

ছ) আমরা বলে থাকি, কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট শক্তি/আয়তন/রং আছে।

জ) পদার্থ দুই/তিন/চার অবস্থায় পাওয়া যায়।

ঝ) পানি ফোটার (Boil) সময় রাসায়নিক/ভৌত পরিবর্তন ঘটে।

৭) শূন্যস্থান পূরণ করো:

ক) পানিকে উত্তপ্ত করলে পানি _____ ।

খ) পানিতে গলে যায় এমন কঠিন পদার্থকে বলে _____ ।

গ) যে তরলে কোনো কঠিন পদার্থ গলে, তাকে বলে _____ ।

ঘ) কিছু কঠিন পদার্থ, যেমন: লবণ ও চিনি, পানিতে _____ ।

ঙ) যখন _____ পরিবর্তন ঘটে, তখন নতুন একটি বস্তুর সৃষ্টি হয় ।

চ) পানির ময়লা পাত্রের তলায় জমা হতে থাকলে, সেই প্রক্রিয়াকে বলে _____ ।

ছ) পাত্রের তলায় জমা হওয়া তলানি রেখে দিয়ে ওপরের স্বচ্ছ পরিষ্কার তরল পদার্থ অন্য পাত্রে ঢেলে নেওয়াকে বলে _____ ।

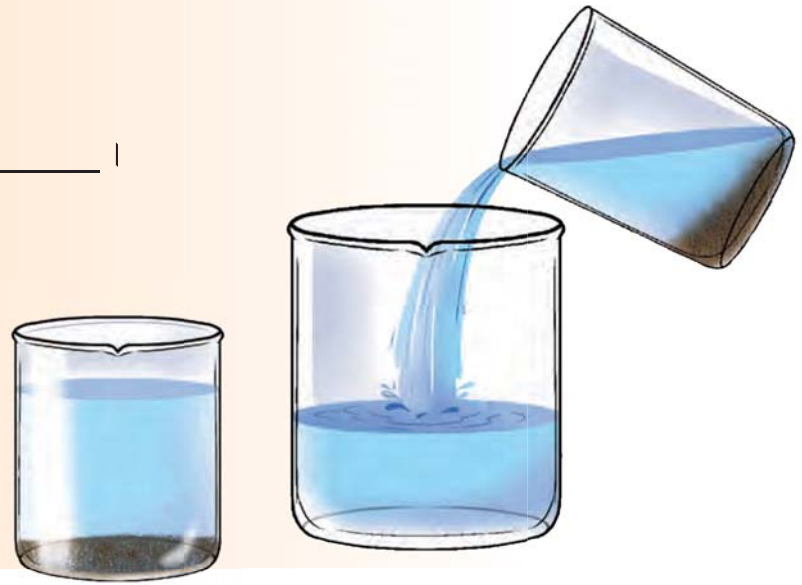

৮) **ঠিক বাক্যে ✔ বা ভুল বাক্যে X চিহ্ন দাও:**

১) বায়বীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে।

২) পানির নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই, তবে নির্দিষ্ট আয়তন আছে।

৩) চাপাতির মণ্ড তৈরি হয় লবণ, পানি ও আটা দিয়ে।

৯) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১) দ্রাবকে দ্রব মেশালে কী পাওয়া যায়?

২) মিশ্রণ বা দ্রবণ থেকে উপাদানগুলো আলাদা করতে বিজ্ঞানীরা যেসব প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন, তার কয়েকটি উল্লেখ করো।

৩) বালি থেকে লোহার গুঁড়া আলাদা করতে কী ব্যবহার করবে?

৪) কোন বস্তুর স্বাদ কেমন, তা বুঝতে কেন সেগুলো মুখে নিয়ে চেখে দেখা যাবে না? দুটো কারণ দেখাও।

১০) তোমার আশপাশের সবকিছু দেখে বলো, কোন কোন জিনিস একটি পদার্থ দিয়ে তৈরি, আর কোন কোন জিনিস একাধিক পদার্থ দিয়ে তৈরি।

১১) চাল পানিতে সেদ্ধ করে ভাত তৈরি হয়। এটা কি ভৌত, নাকি রাসায়নিক পরিবর্তন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

১২) লোহার গুঁড়া, বালি ও তুঁতের মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলো পৃথক করবে কীভাবে?

১৩) লোহায় যখন মরিচা পড়ে, তখন কি কোনো যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়? হয়ে থাকলে সেই যৌগিক পদার্থটি কী এবং কোন কোন বিক্রিয়কের (Reactant) সমন্বয়ে যৌগটি গঠিত?

১৪) ছাঁকন প্রক্রিয়ায় কাচ-শলাকা ব্যবহারের প্রয়োজন কী?

১৫) ছাঁকনে ফানেলের যেদিকে কাগজের তিন স্তর থাকে, সেদিকে কেন মিশ্রণ ঢালতে হয়?

১৬) একটি কাচের বোতল পানিভর্তি করে মুখ ভালোভাবে আটকে ডিপ ফ্রিজে রাখলে কী হবে?

১৭) কেক তৈরির জন্য তেল, আটা, লবণ, চিনি, ডিম ও বেকিং পাউডার একত্রে মিশিয়ে একটি মণ্ড বা পেস্টের (Paste) মতো তৈরি করা হয়। এই পেস্ট কি সাধারণ মিশ্রণ, নাকি যৌগিক পদার্থ? পেস্টটিকে ওভেনে দিয়ে কেক তৈরি করা হয়। কেক কি একটি মিশ্রণ, নাকি যৌগিক পদার্থ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

১৮) কাগজের ঠোঙায় করে চিনি আনতে গিয়ে তোমার হাত থেকে ঠোঙাটি হঠাৎ বালির এক স্তূপের পাশে পড়ে গেল। ফলে অনেকখানি চিনিও বেরিয়ে পড়ল। ওই চিনিটুকু অন্য এক ঠোঙায় তুলতে গিয়ে কিছুটা বালিও ঠোঙায় ঢুকল। ওই চিনিটুকু নিরাপদে ব্যবহারের উপায় কী?

১৯) বাঁ পাশের প্রতি শব্দের সঙ্গে ডানের একটি করে বাক্য মিলাও:

ক) থিতানো	i) বাষ্প যখন তাপ হারিয়ে তরলে পরিণত হয়।
খ) আস্রাবণ	ii) তরলে মিশ্রিত অন্য পদার্থের কণাগুলো যখন তলায় জমতে থাকে।
গ) ছাঁকন	iii) যখন তরল বাষ্পে পরিণত হয়।
ঘ) ঘনীভবন	iv) যখন কোনো কঠিন পদার্থ মিশ্রিত তরলকে ছাঁকন কাগজের মধ্য দিয়ে যেতে দেওয়া হয়।
ঙ) বাষ্পীকরণ	v) যখন তলানি বাদে এক পাত্রে তরল সাবধানে অন্য পাত্রে ঢালা হয়।

পদার্থ	ঘনত্ব (gm/cm^3)
সিসা	11.3
লোহা	7.8
গন্ধক	2.0
কাচ	2.6
রাবার	0.90
পলিথিন	0.92

২০) পানির ঘনত্ব ১ gm/cm^3 হলে কোন পদার্থগুলো পানিতে ভাসবে?

২১) ঠিক বাক্যে ✔ বা ভুল বাক্যে X চিহ্ন দাও:

ক) পদার্থের অণুগুলো চেষ্টা করলে খালি চোখে দেখা যায়।

খ) কাচের অণুগুলো কাঠের অণুর চেয়ে ভিন্ন।

গ) অণুগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব কখনো পরিবর্তিত হয় না।

ঘ) সিসার অণুগুলোর পারস্পরিক আকর্ষণী বল তেলের অণুগুলোর পারস্পরিক আকর্ষণী বলের চেয়ে বেশি।

২২) নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ক) মেঝেতে কঠিন বস্তু রাখলে কোনো দিকে গড়ায় না, তরল পদার্থ কেন গড়িয়ে যায়?

খ) পানির নিচে মাছ শ্বাস নেয় কী করে?

গ) মরিচা কী?

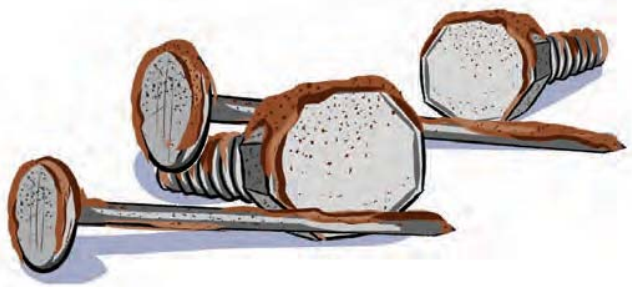

২৩) সঠিক শব্দটি বাছাই করে শূন্যস্থান পূরণ করো:

ক) পদার্থের সব গুণাগুণ বিদ্যমান থাকে, পদার্থের এমন ক্ষুদ্রতম কণার নাম _____ (অণু/পরমাণু/ভর) ।

খ) _____ উঁচু জায়গা থেকে ঢালের দিকে নেমে আসে। (কঠিন পদার্থ/তরল পদার্থ)

গ) _____ লোহাকে আকর্ষণ করে। (চুম্বক/কাঠ)

ঘ) মরিচা পড়া _____ (উপকারী/অপকারী)

২৪) ক) পানিতে গলে, এমন একটি কঠিন পদার্থের নাম বলো।
খ) পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়, এমন দুটো তরলের নাম বলো।
গ) পানিতে দ্রবীভূত হয়, এমন একটি বায়বীয় পদার্থের নাম বলো।

চিন্তার খোরাক:

১) বায়বীয় ছাড়া আর সব পদার্থই দেখা যায়। এমন কী আছে যা দেখা যায়, কিন্তু সেটা পদার্থ নয়।

২) পাশের ছবিতে সাইকেলের চালককে দেখা যাচ্ছে, নাকে-মুখে সে একটি মাস্ক (Mask) লাগিয়ে রেখেছে। কেন? নানাভাবে ক্ষতিকর গ্যাস বের হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশছে। এটা কমাতে আমরা কী কী ব্যবস্থা নিতে পারি?

৩) বস্তুর পরিবর্তন ঘটাতে আমরা অনেক সময় তাপ প্রয়োগ করি। নিচের বস্তুগুলোতে তাপ প্রয়োগ করলে কী ফল হবে?
i) আকার (Size) কি পরিবর্তিত হবে?
ii) রং কি পরিবর্তিত হবে?
iii) গঠনবিন্যাস কি পরিবর্তিত হবে?

বস্তু	তাপ প্রয়োগ পদ্ধতি	তাপ প্রয়োগে ঘটিত পরিবর্তন
ডিম	সেদ্ধ করা	
পানি		
চিনি		
দুধ		

৪) কাদা মিশ্রিত কিছু পানি নাও এবং নিচের তিন রকমে ছাঁকো:

i) কাপড় ব্যবহার করে

ii) ছাঁকনী (Strainer) ব্যবহার করে

iii) ছাঁকন কাগজ ব্যবহার করে

এবার বলো, কোন প্রক্রিয়াটি সবচেয়ে ভালো এবং কেন?

৫) নিচের মিশ্রণগুলো থেকে কীভাবে উপাদানগুলো আলাদা করবে?

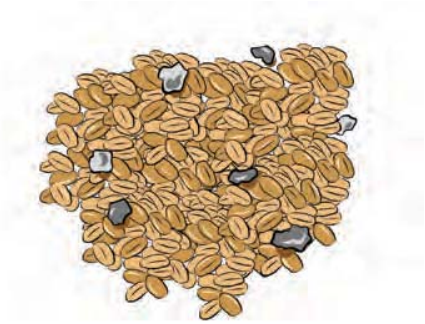

গমের দানার সঙ্গে
মিশ্রিত ছোট পাথরকণা

কিছু চক চূর্ণ ও লবণ চূর্ণের
মিশ্রণ

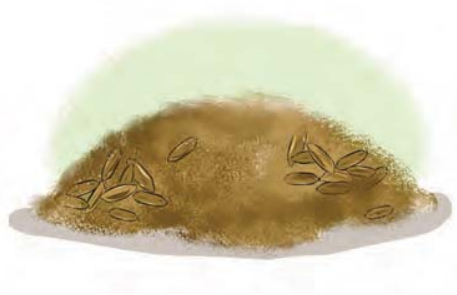

ধানের তুষের সঙ্গে মিশ্রিত
কিছু ধান

ওপরের প্রতিটির ক্ষেত্রে উপাদানগুলো আলাদা করতে তুমি কী কী করেছ, তা নিচের ছকে লেখো:

বস্তু	পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া
পাথর/গম	
.....	
.....	

৬) বালি কঠিন পদার্থ হলেও শুকনো বালি কেন এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে তরল পদার্থের মতো ঢালা যায়? তেমন আর কিছুর কথা বলতে পারো কি?

৭) অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ, বালি ও তুঁতে চূর্ণের মিশ্রণ থেকে উপাদানগুলো পৃথক করা যাবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৮) থার্মোমিটারে পারদ (Mercury) ব্যবহার করা হয়। পারদের কোন বৈশিষ্ট্যকে থার্মোমিটারের কাজে লাগানো হয়?

৯) আগুন জ্বালানো বা দহনক্রিয়া (Combustion) কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের জন্য উপকারী?

১০) চাপ প্রয়োগ করে কোনো বায়বীয় পদার্থকে কোনো পাত্রে তরল ঢোকানোর পর ওই তরল যখন পাত্রের সরু মুখ দিয়ে বেরিয়ে বায়বীয় পদার্থে পরিণত হয়, তখন সেটা ঠাণ্ডা মনে হয় কেন?

১১) ঠাণ্ডা পানির তুলনায় উষ্ণ পানি কেন তাড়াতাড়ি বাষ্পায়িত হয়?

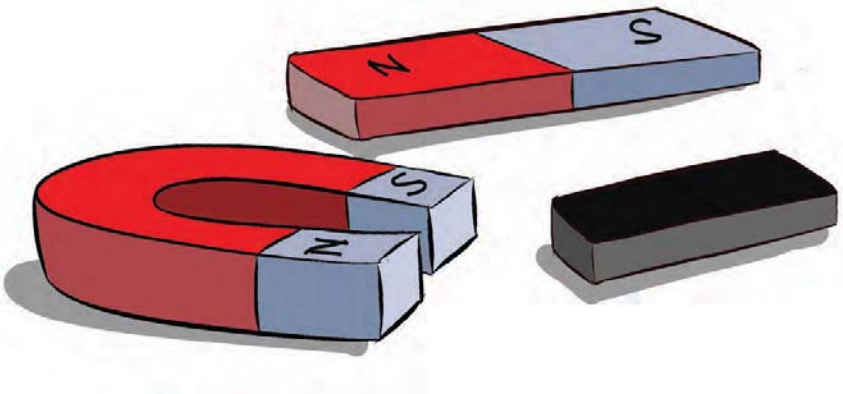

১২) কোন কোন ক্ষেত্রে চুম্বককে কাজে লাগানো হয়? কয়েকটি উদাহরণ দাও।

১৩) নিচের কোন পরিবর্তনগুলোর ক্ষেত্রে অণুগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব কমে, আর কোনগুলোর ক্ষেত্রে দূরত্ব বাড়ে?

ক) কঠিন ইথানল ⟶ তরল ইথানল

খ) তরল ইথানল ⟶ বায়বীয় ইথানল

গ) কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড ⟶ কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস

ঘ) জলীয় বাষ্প ⟶ পানি

১৪) ধাতব পদার্থ বাতাসের সংস্পর্শে না এলে তাতে মরিচা ধরে না। মরিচা প্রতিরোধে আমরা কী কী ব্যবস্থা নিতে পারি?

তৃতীয় অধ্যায়

বল, চাপ ও গতি (Force, Pressure and Motion)

তৃতীয় অধ্যায়

বল, চাপ ও গতি (Force, Pressure and Motion)

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১। বল কী, তা বলতে পারব এবং বিভিন্ন প্রকার বল ব্যাখ্যা করতে পারব।
২। বল পরিমাপ করতে পারব।
৩। চাপ কী, তা বলতে পারব। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলে প্রযুক্ত বলের পরিমাণ থেকে চাপ হিসাব করতে পারব।
৪। স্থিতি ও গতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
৫। বিভিন্ন প্রকার গতি বর্ণনা করতে পারব।
৬। সরণ কী, তা ব্যাখ্যা করতে পারব। সরণ ও দূরত্বের পার্থক্য করতে পারব।
৭। দ্রুতি ও বেগ ব্যাখ্যা করতে পারব এবং এদের পার্থক্য করতে পারব।
৮। সময় ও দূরত্বের পরিমাপ থেকে দ্রুতি হিসাব করতে পারব।

এ অধ্যায়ে কী শিখব

i) বল, ii) বিভিন্ন প্রকারের বল (মাধ্যাকর্ষণ বল, ঘর্ষণ বল, চৌম্বক বল ইত্যাদি), iii) বলের পরিমাপ, iv) চাপ, v) চাপের পরিমাপ, vi) স্থিতি ও গতি, vii) বিভিন্ন প্রকার গতি, ix) সরণ ও দূরত্ব, এদের পার্থক্য x) দ্রুতি ও বেগ, এদের পার্থক্য, xi) দ্রুতির পরিমাপ।

নিচের ছবিগুলোতে কী কী ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ? সব কটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বস্তুর গতি, আকৃতি বা আকার পরিবর্তনের জন্য বস্তুগুলোতে ঠেলা বা টানার মতো বল প্রয়োগ করা হয়েছে। তাহলে বলের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যায়, কোনো বস্তুকে টানা বা ঠেলাকেই বল বলে।

বল কী কাজে লাগে?

স্থির বস্তুতে গতি সঞ্চার করে

গতিশীল বস্তুকে স্থির করে

গতিশীল বস্তুর চলার দিক পরিবর্তন করে

গতিশীল বস্তুর গতির পরিবর্তন করে

বস্তুর আকৃতির পরিবর্তন করে

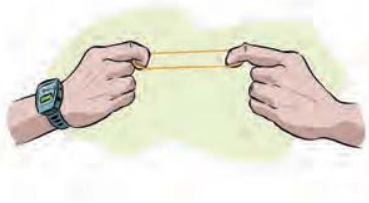

বস্তুর আকার পরিবর্তন করে

তোমরা বন্ধুরা মিলে স্কুলের একটা দেয়াল ঠেলতে শুরু করো তো! নাড়াতে পারোনি নিশ্চয়ই! কিন্তু পরিশ্রম তো ঠিকই হয়েছে তোমাদের। তাহলে বল প্রয়োগ হয়েছে বলা যায় কি?

...তাহলে বলের সংজ্ঞাটি এভাবে করলে আরেকটু ভালো হয়; যা কোনো বস্তুর আকৃতি, আকার ও স্থির অবস্থা বা চলমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় বা ঘটাতে চায়, সেটাই বল।

...এমনকি টিউবওয়েল চেপে পানি তোলাও বল প্রয়োগের উদাহরণ।

বলের কিছু উদাহরণ

ক) টাইলস লাগানো মেঝেতে পিছল খেয়ে পড়ে যেতে দেখেছ হয়তো অনেককেই। আবার শুকনো ফুটবল মাঠে বা পাকা রাস্তায় নিশ্চয়ই চট করে কেউ আছাড় খাওনি! কেন, বলো তো? দুটো বস্তু যখন পরস্পরের সঙ্গে ঘষা খায়, তখনই ঘর্ষণজনিত বল তৈরি হয়। যে তলের ওপরে কোনো বস্তু ঘষা খাবে, সেই তলটি অমসৃণ হলে ঘর্ষণবলও বেশি হবে। ঘর্ষণজনিত বল কোনো ঢাল বেয়ে চলমান বস্তুর গতি কমিয়ে দেয়। ঘর্ষণজনিত বল সব সময় চলমান বস্তুর গতির উল্টো দিকে কাজ করে এবং এর ফলে তাপ (কম বা বেশি) উৎপন্ন হয়। ঘর্ষণজনিত বলের কারণেই আমরা আঙুল দিয়ে কলম চেপে ধরে কাগজে লিখতে পারি। এই ঘর্ষণের ফলেই রাস্তায় একটি গাড়ি চলতে পারে। আবার পিচ্ছিল বা মসৃণ তলের ওপর ঘর্ষণের পরিমাণ কম থাকে। যেমন– সাবানের ফেনায় বা কলার খোসায় পিছলে পড়ার ঘটনা তো আমরা হরহামেশাই দেখি। ঘর্ষণ বেশি হলে বস্তুর ব্যবহারজনিত ক্ষয় অনেক বেশি হয়। তেল, মোম বা গ্রিজের মতো পিচ্ছিল পদার্থ ব্যবহার করে আমরা ঘর্ষণজনিত বল কমাতে পারি। এ ছাড়া ভারী বাক্স নড়ানোর ক্ষেত্রে মেঝে মসৃণ হলে বা বাক্সের নিচে চাকা লাগানো থাকলে নড়ানোর কাজটি সহজ হয়।

জানো কি?

ক্যারম খেলার সময় খেলোয়াড়েরা বোর্ডে মিহি পাউডার ছিটিয়ে নেয় কেন বলতে পারো? কারণ, তাতে বোর্ডটি পিচ্ছিল হয়ে যায় এবং স্ট্রাইকার তখন কম ঘর্ষণে চলতে পারে, নয়তো বোর্ডের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে স্ট্রাইকারের গতি অনেক কমে যায়।

খ) চৌম্বক বলও একধরনের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল, যা চুম্বকের কারণে সৃষ্টি হয়।

নিজে করে দেখো

একটা চুম্বককে কতকগুলো আলপিনের কাছে নিয়ে এসো। দেখবে, আলপিনগুলো চুম্বকের দিকে আকর্ষিত হয়ে চুম্বকের সঙ্গে আটকে গেছে। এবার আলপিনগুলো চুম্বক থেকে আলাদা করার চেষ্টা করো। তুমি এবারে স্পষ্ট অনুভব করবে যে, কোনো একটি বল আলপিনগুলোকে চুম্বকের সঙ্গে আটকে রাখার চেষ্টা করছে। এটাই চৌম্বক বল।

গ) মাধ্যাকর্ষণ বল বা মহাকর্ষ বল হচ্ছে দুটো বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল। যে বলের কারণে পৃথিবী আমাদেরকে আকর্ষণ করে এবং আমরা লাফ দিয়ে আবার নিচে এসে পড়ি, সেই একই বলের কারণে সূর্যের চারপাশে গ্রহগুলো ঘুরতে থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: মনে রাখা ভালো, মহাকর্ষ বল কেবল আকর্ষণ করে, পক্ষান্তরে চৌম্বক বল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করতে পারে।

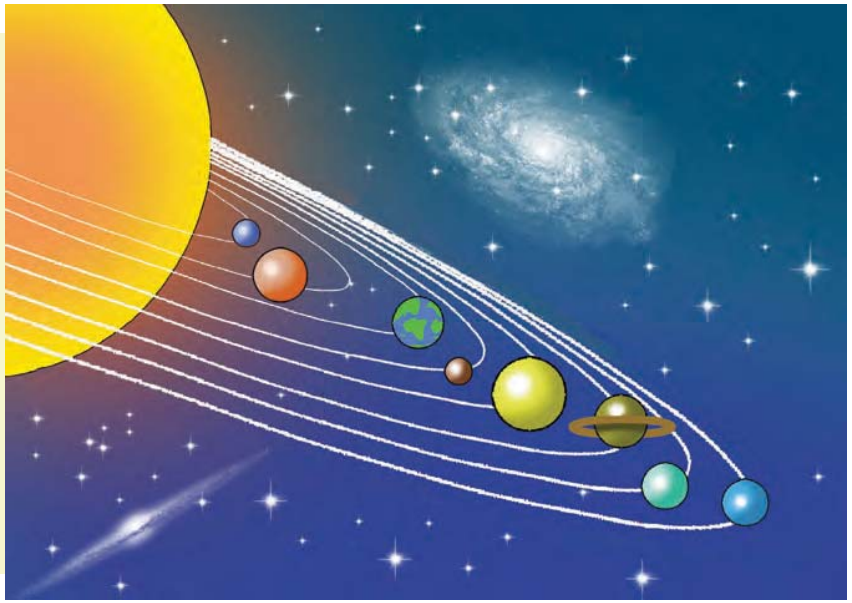

বলের এস. আই. একক:

ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের নামানুসারে বলের এস. আই. একক হচ্ছে নিউটন (Newton = N)। পৃথিবীপৃষ্ঠে ১০০g ভরের ওজন হচ্ছে প্রায় ১ N।

নিজে করে দেখো:

১ নিউটন বল কি খুব বেশি, নাকি কম? মাঝারি আকারের একটি আপেল বা একটি পেয়ারা নাও, যাদের ভর ১০০ গ্রামের কাছাকাছি। এগুলো তোমার হাতে বল প্রয়োগ করছে, মানে নিচের দিকে টেনে ধরছে, তা কি টের পাচ্ছ? ওজনও কিন্তু একধরনের বল।

বলের পরিমাপ:

স্প্রিংকে যখন টানা হয় তখন সেটা লম্বা হয়ে যায় এবং চাপ দিলে সেটা ছোট হয়ে যায়। যত বেশি বল প্রয়োগ করা হয়, স্প্রিংটি তত বেশি লম্বা বা ছোট হয়; আর এ কারণেই বল মাপার ক্ষেত্রে স্প্রিং ব্যবহার করা যায়। একটি স্প্রিং ব্যালেন্সে একটি নির্দেশক কাঁটা (Pointer) যুক্ত থাকে, যেটা একটি স্কেল বরাবর ওঠানামা করে আর স্প্রিংয়ের দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন দেখে বোঝা যাবে, কী পরিমাণ বল তার ওপর কাজ করছে।

চাপ

একটা আলপিনের ওপর আঙুল দিয়ে হালকা জোরে চাপ দাও তো! ব্যথা পাচ্ছ? এবার আলপিনটার ভোঁতা প্রান্তে একই রকম জোরে আঙুল দিয়ে চাপ দাও। এবার কি আগের মতো ব্যথা লাগছে?

আবার ছুরির ভোঁতা প্রান্ত দিয়ে কিছু কাটার চেষ্টা করে দেখো তো? অসুবিধা হচ্ছে, তাই না? কেন, বলো তো?

যখন কোনো একটি তলের ওপর বল প্রয়োগ করা হয়, সেটা তলের অনেকখানি জায়গা নিয়ে কাজ করে। তলের ওই জায়গাটুকুকে ছোট ছোট এককে ভাগ করলে প্রতি এককের ওপর যে পরিমাণ বল কাজ করবে সেটাই চাপ। এই তলের পরিমাপের ওপর নির্ভর করে একই বল কম বা বেশি চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

যখন আলপিনের তীক্ষ্ণ আগায় আঙুলে চাপ দাও, তখন পুরো বল ওই আলপিনের আগার সামান্য ক্ষেত্রফলের ওপর প্রযুক্ত হয়, ফলে চাপ অনেক বেশি হয়। কোনো একটি বোর্ডে যখন বোর্ড-পিন লাগানো হয়, তখন পিনটি বোর্ডের ওপরে খুব বেশি পরিমাণ চাপ দেয়। কারণ, বোর্ডের ওপরে প্রযুক্ত সম্পূর্ণ বল পিনের চোখা মাথায় একত্র হয়।

দুটো সমান ক্ষেত্রফলের তলের ওপর বল প্রয়োগ করলে যেটিতে বল বেশি হবে, সেখানে চাপও বেশি হবে। চাপকে একক ক্ষেত্রফলের ওপরে প্রযুক্ত বল বলা হয়।

অর্থাৎ, চাপ = বল/(ক্ষেত্রফল)

চাপের এস. আই. একক হচ্ছে প্যাসকেল (Pascal = Pa) অথবা N/m^2।

এখানে ১ Pa = ১ N/m^2।

স্থিতি ও গতি

ক) স্থিতি: তোমার স্কুলঘরটি গতকাল যেখানে ছিল, আজও সেখানেই রয়েছে এবং যত দিন না কোনো কারণে সেটা ভাঙা বা সরানো হয়, তত দিন একই স্থানে থাকবে। একইভাবে ঘরবাড়ি, গাছপালা এখন যেখানে আছে, এক ঘণ্টা, এক দিন বা এক মাস পরেও দেখা যাবে, একই জায়গায় আছে। এগুলোকে বলা হয় স্থির বস্তু এবং এদের ওই অবস্থাকে বলে স্থিতি। অর্থাৎ, সময় পরিবর্তনের সঙ্গে কোনো বস্তু তার আশপাশের অন্যান্য বস্তুর অবস্থানের তুলনায় স্থান পরিবর্তন না করলে বস্তুটিকে স্থির বস্তু বলে এবং বস্তুটির ওই অবস্থাকে স্থিতি বলে।

খ) গতি: একটি বাস বা রেলগাড়ি যখন স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকে তখন তারা স্থির। কিন্তু চলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই স্থান পরিবর্তন হতে থাকে। ১০ মিনিট পর দেখা যাবে তারা এক জায়গায়, এক ঘণ্টা পর আবার অন্য জায়গায়। অর্থাৎ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটছে। এদের বলা হয় গতিশীল বা সচল বস্তু। আর বস্তুর এই সচল অবস্থাকে গতি বলে। অর্থাৎ, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে কোনো বস্তু তার আশপাশের অন্যান্য বস্তুর অবস্থানের তুলনায় স্থান পরিবর্তন করলে বস্তুটিকে গতিশীল বস্তু বলা হয় এবং বস্তুটির ওই অবস্থাকে বলা হয় গতি।

এখানে লক্ষণীয়, কোনো বস্তু স্থির, নাকি গতিশীল, তা বোঝা যায় আশপাশে বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে। কিন্তু চলন্ত রেলগাড়িতে অন্যান্য যাত্রীর তুলনায় তোমার অবস্থানের কি কোনো পরিবর্তন হবে? এমতাবস্থায়, ট্রেনের কামরার মধ্যে সবকিছু তোমার কাছে স্থির মনে হবে, অথচ ট্রেনটি গতিশীল।

একইভাবে, পৃথিবীপৃষ্ঠে ঘরবাড়ি, গাছপালার তুলনায় এর উপরস্থ বাড়িঘর, গাছপালা সব স্থির। কিন্তু পৃথিবীর বাইরে থেকে দেখলে দেখা যাবে, পৃথিবী নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘণ্টায় গড়ে প্রায় ১২০০ কি. মি. বেগে ঘুরছে এবং সূর্যকে কেন্দ্র করেও ঘুরছে। অতএব, পৃথিবীর বাইরে থেকে দেখলে পৃথিবীর সবকিছুই গতিশীল। কোনো চলমান বস্তুর ওপর বল প্রয়োগ করলে তার গতির পরিবর্তন হয়। চলন্ত বস্তুতে যদি কোনো বল প্রয়োগ করা না হয়, তাহলে বস্তুটি একই দিকে, একই গতিতে চিরকাল চলতে থাকবে।

নানা রকম গতি

ট্রেন চলা, সাইকেলের চাকা ঘোরা, ঘড়ির কাঁটা ঘোরা, দোলনার দোলন– এ সবই ভিন্ন ভিন্ন রকমের গতি।

ক) রৈখিক গতি

কোনো বস্তুকে ওপরে তুলে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেটা সোজা নিচে পড়বে। এভাবে, কোনো বস্তু যদি সরলরেখা বরাবর চলে, তবে ওই বস্তুটির গতিকে রৈখিক গতি বলে। বন্দুকের গুলির গতিও রৈখিক গতি।

খ) বক্রগতি

রাস্তায় চলমান বিভিন্ন যানবাহন একদম সরলপথে খুব কম সময়ই চলতে পারে। কেননা, তাদেরকে বিভিন্ন প্রয়োজনে বাঁক নিতে হয়। তাই এদের গতিকে বক্রগতি বলে।

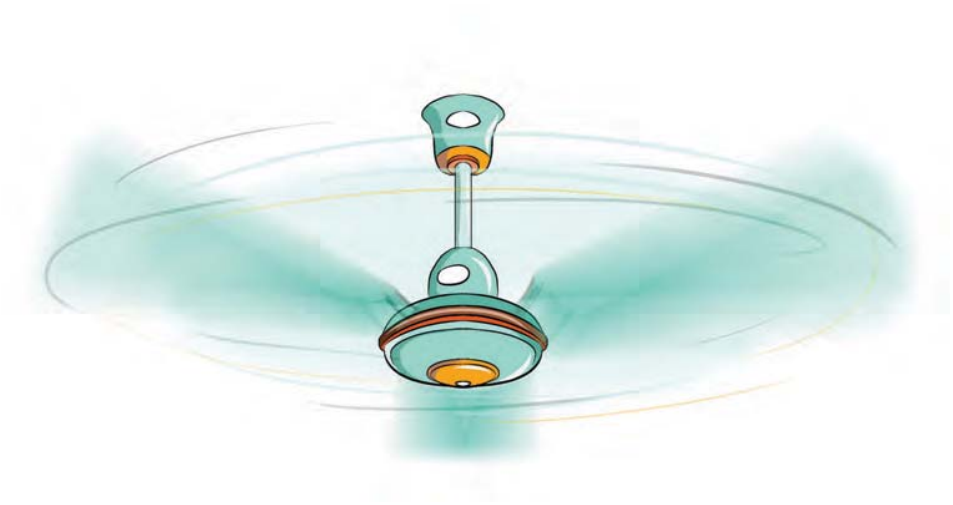

গ) ঘূর্ণন গতি

ছোট এক টুকরা মজবুত সুতার এক মাথায় ছোট একটি পাথর বেঁধে সুতার অন্য প্রান্ত ধরে যদি ঘুরাতে থাকি, তাহলে পাথরটির গতিকে বলা হবে ঘূর্ণন গতি। অর্থাৎ, কোনো বিন্দু বা অক্ষকে কেন্দ্র করে কোনো বস্তু যখন ঘুরতে থাকে, তখন বস্তুটির গতিকে ঘূর্ণন গতি বলে। বৈদ্যুতিক পাখার গতি, পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তনের গতি ইত্যাদি ঘূর্ণন গতি।

ঘ) পর্যায় গতি

সুতার মাথায় বাঁধা পাথর ঘুরানোর সময় যদি প্রতিটি ঘূর্ণনের সময় একই হয়, তবে সেই গতিকে পর্যায় গতি বলে। পৃথিবী একবার নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে আবর্তনে সব সময়ই ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। সুতরাং, পৃথিবীর এই গতি আবর্তন পর্যায় গতি। অর্থাৎ, কোনো বস্তু যদি নির্দিষ্ট সময় পর পর তার গতিপথের একই বিন্দু দিয়ে একই দিকে যায়, তবে বস্তুটির গতিকে পর্যায় গতি বলে। ঘড়ির কাঁটার গতি, বৈদ্যুতিক পাখার গতি, গ্রামোফোন রেকর্ডের গতি ইত্যাদি পর্যায় গতি।

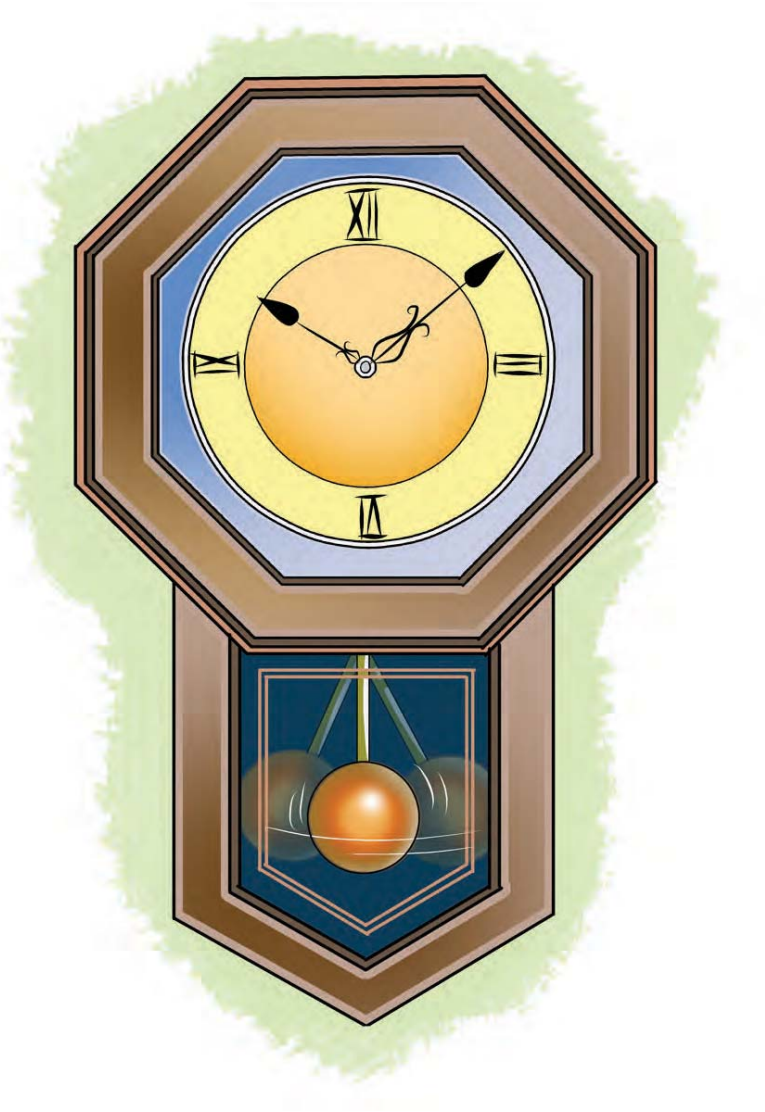

ঙ) দোলন গতি

সুতায় বাঁধা একটি পাথর তুমি ঝুলিয়ে ধরে রাখো। অন্য হাতে পাথরটিকে এক পাশে সামান্য টেনে ধরে ছেড়ে দাও। দেখবে, পাথরটি ডানে-বাঁয়ে অনবরত দুলছে। পাথরটি একবার ডানে গেলে একটু পরেই আবার সেটা বাঁ থেকে ডানে আসে। পাথরটির এই গতিকে দোলন গতি বলে। ঘড়ির দোলকের গতি, দোলনার গতিও দোলন গতি। দোলন গতি একরকম পর্যায় গতি। তবে পার্থক্য এই, দোলন গতি সম্পন্ন বস্তুর গতি নির্দিষ্ট সময় পর পর বিপরীতমুখী হয়। সব দোলন গতিই পর্যায় গতি, কিন্তু সব পর্যায় গতি দোলন গতি নয়। যেমন; ঘড়ির দোলকের গতি একই সঙ্গে দোলন গতি ও পর্যায় গতি। কিন্তু ঘড়ির কাঁটার গতি শুধু পর্যায় গতি, এটা দোলন গতি নয়।

চ) জটিল গতি

চলন্ত সাইকেলের চাকার ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলটিও সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এ রকম কোনো বস্তুর যখন একই সঙ্গে চলন ও ঘূর্ণন গতি থাকে, তখন বস্তুটির গতিকে জটিল গতি বলে। চলন্ত মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি বা রিকশার চাকার গতি– এগুলো জটিল গতি।

সরণ, দ্রুতি ও বেগ

সরণ

তোমার বাসা থেকে স্কুলে আসতে কত সময় লাগে? তুমি যেই পথ ধরে রোজ আসো, অন্য পথে এলে কি একই সময় লাগবে? সেটা নির্ভর করবে বাসা থেকে কতটা ঘুরে আসতে হবে অর্থাৎ কতটা দূরত্ব অতিক্রম করছ তার ওপর, তাই না?

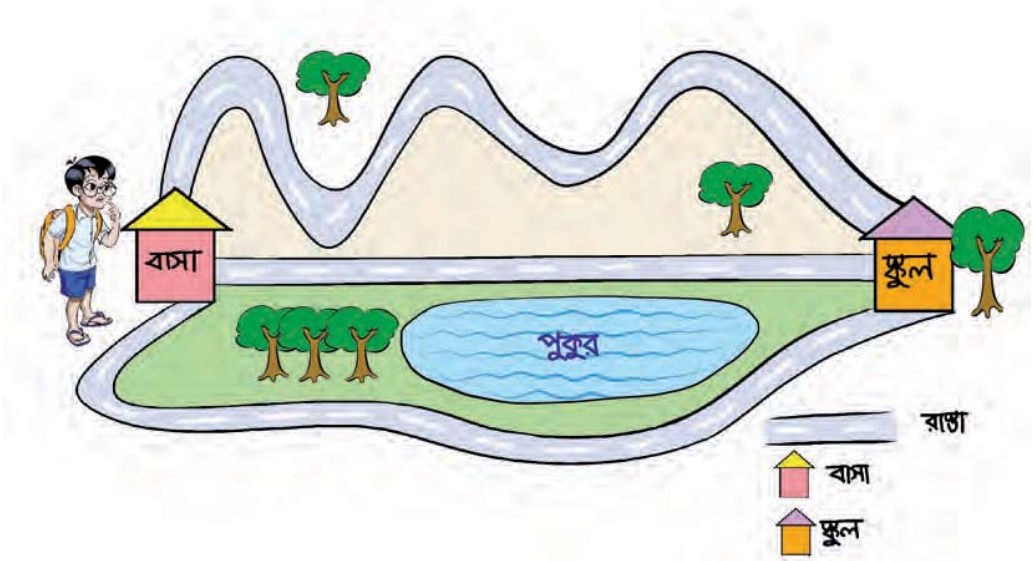

ধরো, পিয়াল তার বাসা থেকে বের হয়ে তিনটি রাস্তা দিয়ে স্কুলে যেতে পারে। তার মানে কী দাঁড়াচ্ছে? একেক রাস্তা দিয়ে গেলে একেক পরিমাণ দূরত্ব পার হতে হচ্ছে। যদিও স্কুল বা পিয়ালের বাসা একই জায়গায় আছে। এখন বলো দেখি, সবচেয়ে কম দূরত্ব পার হতে হবে কোন রাস্তা দিয়ে গেলে? নিশ্চয়ই বাসা থেকে নাক বরাবর সোজা যে রাস্তা গেছে, সেটা দিয়ে! বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলে সরণ, অর্থাৎ তুমি তোমার অবস্থান থেকে সোজা অন্য একটি অবস্থান বরাবর যে দূরত্ব পাড়ি দাও, তাই হচ্ছে সরণের পরিমাপ। বুঝতেই পারছ, এখানে অবধারিতভাবেই একটা দিকনির্দেশের বিষয় চলে আসছে। সরণের দিক হচ্ছে তোমার আগের অবস্থান থেকে পরবর্তী অবস্থান বরাবর যেই দিক, সেই দিকে।

অতএব বলা যায়, কোনো গতিশীল বস্তুর একটি নির্দিষ্ট দিকে অবস্থানের পরিবর্তনকে সরণ বলে এবং বস্তুটির প্রথম ও শেষ অবস্থানের মধ্যকার সরলরৈখিক দূরত্ব হচ্ছে সরণের পরিমাপ। সরণ একটি দূরত্ব, সুতরাং, সরণের একক আর দৈর্ঘ্যের একক একই, আর এস. আই. স্কেলে সেটি হচ্ছে মিটার।

দ্রুতি (Speed)

বাড়ি থেকে ১০০০ মিটার দূরে অবস্থিত স্কুলে হেঁটে যেতে তোমার ২০ মিনিট লাগে। অর্থাৎ, ১ মিনিটে তুমি ৫০ মিটার পথ হাঁটতে পারো। এ ক্ষেত্রে, তোমার দ্রুতি হচ্ছে ৫০ মিটার/মিনিটে। তুমি সোজা পথে, নাকি বাঁকা পথে স্কুলে গেলে, তার ওপর দ্রুতি নির্ভর করে না। মোট কত সময়ে মোট কত দূরত্ব তুমি অতিক্রম করতে পারো, তার ওপর দ্রুতি নির্ভর করে। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো বস্তু একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে গতি বলে। দ্রুতির একক মিটার/সেকেন্ড।

অর্থাৎ, দ্রুতি = (দূরত্ব)/সময়

দ্রুতি একটি অদিক রাশি। অর্থাৎ, এর সুনির্দিষ্ট কোনো দিক নেই।

বেগ (Velocity)

দ্রুতির যদি কোনো নির্দিষ্ট দিক থাকে তবে তাকে বেগ বলে। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট দিকে কোনো বস্তু একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে বেগ বলে। আগেই জেনেছি, নির্দিষ্ট দিকে অবস্থানের পরিবর্তন অর্থাৎ অতিক্রান্ত দূরত্বকে বলা হয় সরণ।

বেগ = সরণ/সময়

বুঝতেই পারছ, বেগ একটি দিক রাশি। অর্থাৎ, এর সুনির্দিষ্ট দিক রয়েছে।

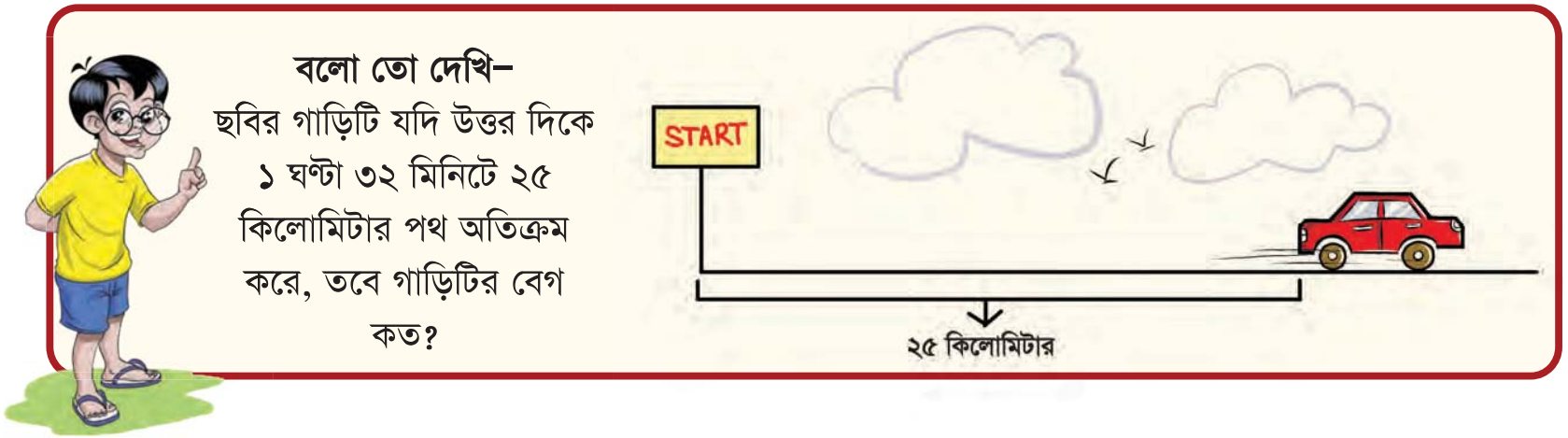

অনুশীলন: (নিজে করি)

১. বলের বিভিন্ন ফলাফল তালিকাভুক্ত করো। প্রতিটির একটি করে উদাহরণ দাও।

২. নিচের বলগুলো কোন ধরনের:

একটি ম্যাচের কাঠি জ্বালাতে যে বল প্রযুক্ত হয়।

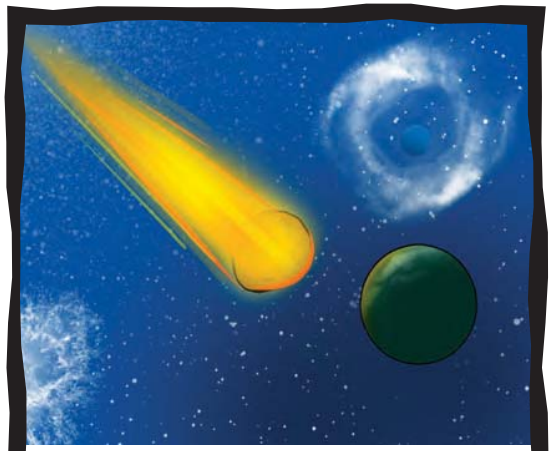

যে বল দ্বারা চাঁদ মহাশূন্যে পতিত উল্কাপিণ্ডকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে।

কম্পাস বা দিকদর্শন যন্ত্রের কাঁটার দিক যে বল দ্বারা পরিবর্তিত হয়।

৩. বল, চাপ ও ক্ষেত্রফলের মধ্যে সম্পর্ক দেখিয়ে নিম্নলিখিতগুলো ব্যাখ্যা করো:

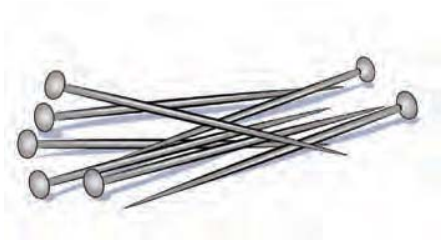

একটি আলপিনের চোখা মাথা।

ভারী যানবাহনের চওড়া চাকা থাকে।

৪. নিচের কোনটি সত্য? যুক্তি দাও।

১। ঘর্ষণ বল শুধু দুটি কঠিন পদার্থের মধ্যে কাজ করে।

২। ঘর্ষণ বল শুধু দুটি রুক্ষ বা অসমতল তলের মধ্যে সৃষ্টি হয়।

৩। শুধু যখন দুটি তল পরস্পরকে স্পর্শ করে, তখনই ঘর্ষণ বলের সৃষ্টি হয়।

৫. একটি ছেলে ঘাসে ঢাকা একটা ঢালে বসে আছে। যেহেতু ঢালু তল, কাজেই তার গড়িয়ে নিচে পড়ার কথা, তাহলে কোন বলের সাহায্যে সে বসে থাকতে পারছে?

১। ওজন
২। অভিকর্ষ বল
৩। ঘর্ষণ বল

৬. দ্রুত গতিতে চলা একটা বাইসাইকেলের বেগ কমিয়ে আনতে তুমি কী করো? কেন, ব্যাখ্যা করো।

১। প্যাডল থেকে পা মাটিতে নামিয়ে এনে আস্তে আস্তে বেগ কমাও।
২। আরও দ্রুত প্যাডল চালাও।
৩। প্যাডল চালানো বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকো।

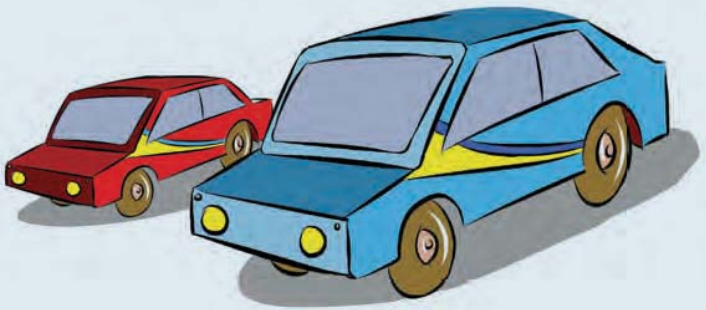

৭. দুটি খেলনা গাড়ি। এর মধ্যে একটা আরেকটার চেয়ে বড় ও ভারী; এদের ওপর একই বল প্রয়োগ করে ধাক্কা দেওয়া হলো। কোন গাড়িটা বেশি দূর যাবে? কেন?

৮. ঢালু রাস্তা বেয়ে একটা পাথর গড়িয়ে দিলে এর বেগের কী পরিবর্তন হবে?

১। আস্তে আস্তে বাড়বে;

২। বেগ কমতে থাকবে;

৩। একই বেগে গড়িয়ে নামতে থাকবে।

৯. একটা বিল্ডিংয়ের ওপর থেকে একটা কাগজ আর একটা নুড়িপাথর ছেড়ে দেওয়া হলো। স্বাভাবিকভাবেই দুটি বস্তুই নিচের দিকে পড়তে শুরু করল। এখন–

১। কোন শক্তির ফলে বস্তুগুলো নিচের দিকে পড়ছে?

২। দুটি কি একই সঙ্গে নিচে পড়বে, নাকি কোনো একটা বস্তু আগে নিচে পড়বে? কেন?

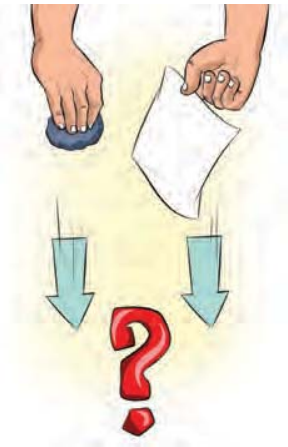

১০. দুই পায়ের বদলে এক পায়ে দাঁড়ালে এক পায়ের ওপর চাপ বেশি পড়বে, নাকি কম পড়বে?

১১. নিচের কোনটি বলের উদাহরণ নয়?

১। ঘর্ষণ
২। ভর
৩। ওজন
৪। তাপ

১২. নিচের কোন সমতলের ওপর একটা ফুটবল গড়িয়ে দিলে বলটি বেশি দূর পর্যন্ত যাবে? কেন?

১। ঘাসে ঢাকা মাঠ
২। ইটের রাস্তা
৩। টাইলসের মেঝে

১৩. ধরো, তুমি বাজার থেকে এক জোড়া আনারস কিনে আনলে। দোকানি আনারস দুটি ভালো করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। অর্ধেক রাস্তা আসতেই আনারসের ওজনে দড়িটা হাতে এমনভাবে চেপে বসতে লাগল যে তোমার রীতিমতো হাত ব্যথা হয়ে যাওয়ার জোগাড়! এখন তুমি যদি দড়িতে একটা রুমাল জড়িয়ে তারপর হাতে নাও, কষ্ট কম হবে কি? কেন?

চতুর্থ অধ্যায়

কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা (Work, Energy and Power)

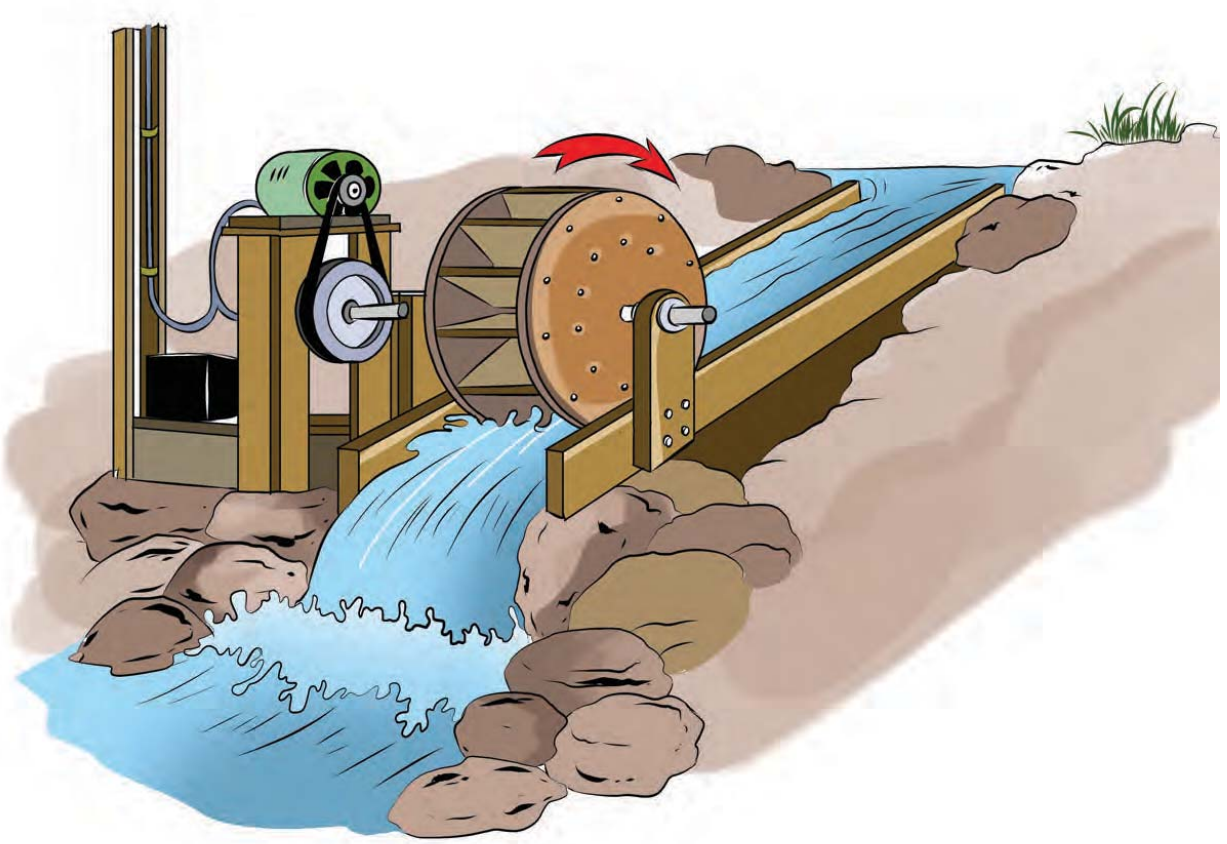

চতুর্থ অধ্যায়

কাজ, শক্তি ও ক্ষমতা (Work, Energy and Power)

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১। কাজ কী, তা ব্যাখ্যা করতে পারব। কাজের পরিমাপ করতে পারব।
২। ক্ষমতা কী, তা ব্যাখ্যা করতে পারব। কাজের পরিমাণ থেকে ক্ষমতা পরিমাপ করতে পারব।
৩। শক্তি কী, তা বলতে পারব। কাজের সঙ্গে শক্তির সম্পর্ক করতে পারব।
৪। শক্তির বিভিন্ন রূপ ও পারস্পরিক রূপান্তর ব্যাখ্যা করতে পারব।
৫। শক্তির নিত্যতা সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারব।
৬। নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য শক্তির পার্থক্য করতে পারব।
৭। আশপাশের সবাইকে নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করব।

এ অধ্যায়ে কী শিখব

i) কাজ ও কাজের পরিমাপ, ii) ক্ষমতা ও এর পরিমাপ, iii) শক্তি, iV) কাজ ও শক্তির সম্পর্ক, V) শক্তির বিভিন্ন রূপ, Vi) শক্তির রূপান্তর, Vii) শক্তির নিত্যতা বা অবিনাশিতাবাদ সূত্র, ix) নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য শক্তি।

কাজ (Work)

কাজ শব্দটা আমরা সব সময়েই ব্যবহার করি বিভিন্ন অর্থে। কথায় কথায় আমরা অনেক সময় বলি, অমুক অনেক কাজের ছেলে, কিংবা তমুক এত অলস যে সারা দিন কোনো কাজ করে না। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাজের সংজ্ঞা কিন্তু অন্য রকম। নিচের ছবিগুলো লক্ষ করো।

পিয়াল আর লিপি দুজনে মিলে ভারী একটা পাথরকে মাটি থেকে ট্রাকে উঠিয়েছে। তারা কি ওই পাথরটার ওপর কোনো কাজ করেছে?

জামাল ও কামাল দুজনে মিলে তাদের গাড়িটাকে ১০ মিনিট ধরে ঠেলে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু গাড়িটা একটুও নড়ল না। তারা কি গাড়িটার ওপরে কোনো কাজ করেছে?

বিজ্ঞানে কাজের সংজ্ঞা অনুসারে, পিয়াল ও লিপি পাথরটির ওপরে কাজ করেছে, কিন্তু জামাল ও কামাল গাড়িটির ওপরে কোনো কাজ করেনি। কারণ, গাড়িটি একটুও নড়েনি, যদিও তারা গাড়িটার ওপরে অনেক বল প্রয়োগ করেছিল।

কতটুকু কাজ হলো বুঝব কী করে?

কাজের একক

কাজের একক হলো জুল। ১ নিউটন বল প্রয়োগ করে তুমি যখন কোনো একটি বস্তুকে বলের দিকে ১ মিটার সরাও, তখন তুমি ১ জুল (J) বা ১ নিউটন-মিটার (Nm) পরিমাণ কাজ করেছ বলা যায়।

বড় এককের কাজও আছে যেমন; কিলোজুল (KJ) এবং মেগাজুল (MJ), যেখানে ১ KJ = ১০০০ J এবং ১ MJ = ১০০০ ০০০ J। শক্তিও জুলে মাপা হয়। কারণ, কাজ করতে শক্তির প্রয়োজন হয়।

কতটুকু কাজ করা হলো তা কিসের ওপর নির্ভর করে?

কী পরিমাণ কাজ করা হলো তা নির্ভর করে–

- ✔ কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হয়েছে তার ওপর এবং
- ✔ বলের দিকে বস্তুটি কতটুকু সরে গেল তার ওপর।

কাজের কিছু উদাহরণ

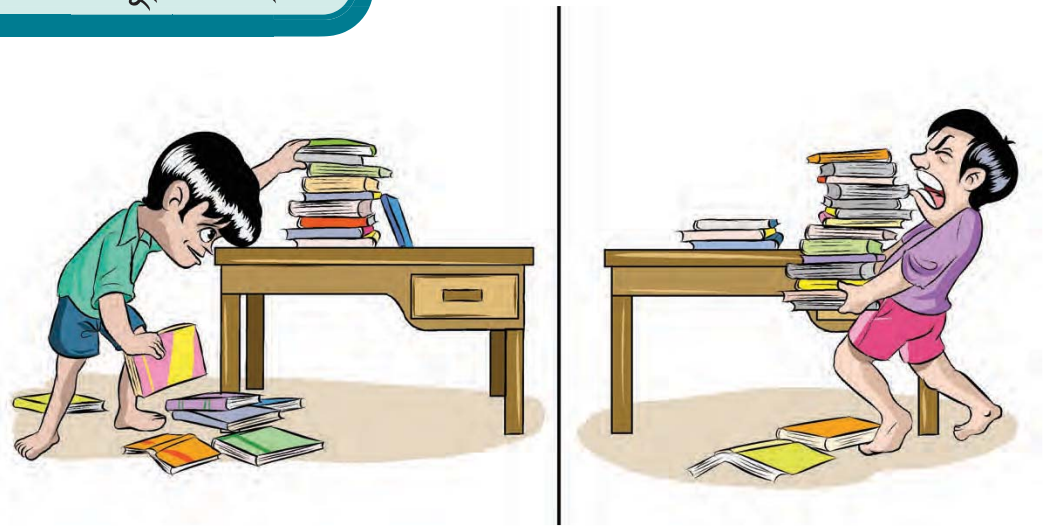

পাশের ছবিগুলো তুলনা করো। মেঝে থেকে বইগুলোকে একই উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কোন ক্ষেত্রে বেশি বল প্রয়োগ করতে হয়েছে? কোন ক্ষেত্রে বেশি কাজ করা হয়েছে?

বাড়ি বদলানোর সময় শুভ্ররা একটা টেলিভিশন নিচতলা থেকে তৃতীয় তলায় নিয়ে যেতে হাঁপিয়ে উঠল; অন্যদিকে দোতলার নতুন ভাড়াটিয়া তাদের টেলিভিশন বয়ে আনল দোতলায়। কোন ক্ষেত্রে বেশি কাজ করা হয়েছে ?

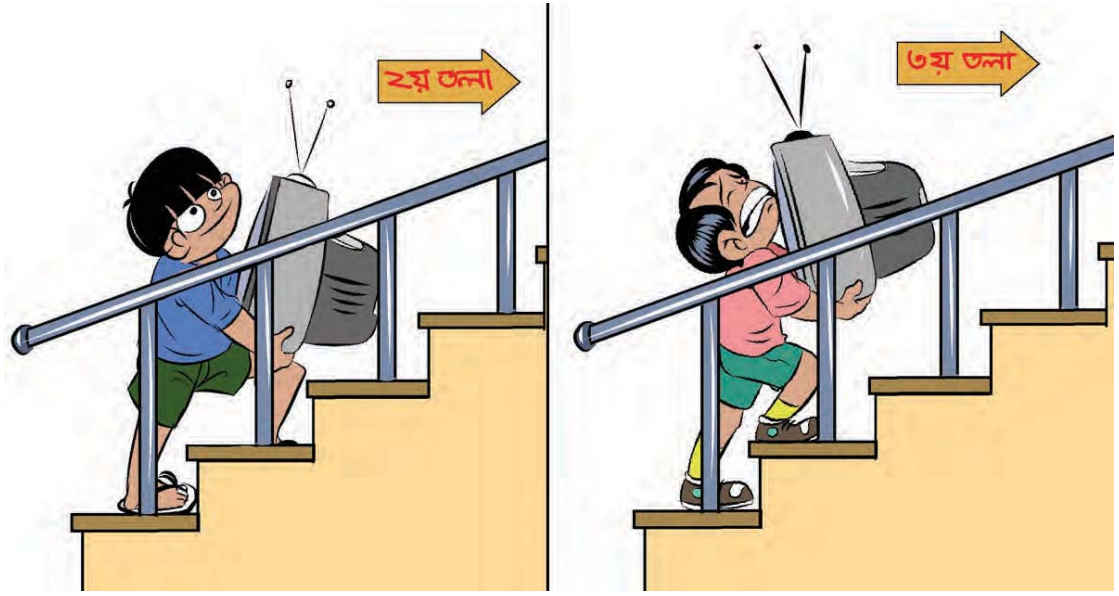

কাজের পরিমাণের হিসাব

বলের পরিমাণ ও বলের দিকে বস্তুর সরণ– এ দুটো জানা থাকলে নিচের সূত্রানুসারে কী পরিমাণ কাজ করা হলো, তা বের করা যায়।

কাজের পরিমাণ = বল X বলের দিকে বস্তুর সরণ

উদাহরণ

i) ৪০ N বল প্রয়োগ করে জামাল একটি গাড়িকে ভূমির সমান্তরাল মেঝের ওপর দিয়ে ২ মিটার ঠেলে নিয়ে গেল। সে কী পরিমাণ কাজ করল?

সমাধান:

কাজের পরিমাণ = বল × বলের দিকে বস্তুর সরণ

= ৪০ N × ২m

= ৮০ Nm

= ৮০ J.

এবার নিজে বলো

ছোট একটি যন্ত্রের সাহায্যে ১০টি বাক্সকে, যাদের প্রতিটির ওজন ৫০০ নিউটন, মেঝে থেকে খাড়া ওপরের দিকে ২ মিটার ওঠানো হলো। যন্ত্রটি কী পরিমাণ কাজ করল?

ক্ষমতা (Power)

ছবিতে দেখো, দুজন লোক রাস্তা থেকে ট্রাকে ইট তুলছে। ১ মিনিট সময়ে ১ জন তুলছে ৬টি ইট, অপরজন ১২টি। কার ক্ষমতা বেশি? অবশ্যই দ্বিতীয় লোকটির। কারণ, একই সময়ে প্রথম লোকের তুলনায় দ্বিতীয় লোকটি দ্বিগুণ কাজ করছে। অন্যভাবে বলা যায়, যে তাড়াতাড়ি কাজ করে তার ক্ষমতা বেশি। এককথায়, একক সময়ে যে পরিমাণ কাজ করা হয়, তাকে ক্ষমতা বলে।

অর্থাৎ, ক্ষমতা = (কাজের পরিমাণ)/সময়

কাজের একক জুল, সময়ের একক সেকেন্ড। সুতরাং, ক্ষমতার একক জুল/সেকেন্ড। ক্ষমতার এই এককের আরেক নাম ওয়াট।

অর্থাৎ,
১ ওয়াট = (১ জুল)/(১ সেকেন্ড)

ক্ষমতার এই একক অনেক ছোট বলে আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় একক কিলোওয়াট ব্যবহার করি। ১ কিলোওয়াট = ১০০০ ওয়াট।

এর আগে দুই ব্যক্তির ট্রাকে ইট তোলার যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রথম লোকটি যদি ১ মিনিট বা ৬০ সেকেন্ডে ৬০০ জুল কাজ করে থাকে, তবে তার ক্ষমতা = (কাজের পরিমাণ)/সময় = ৬০০/৬০ = ১০ ওয়াট।

একই সময়ে দ্বিতীয় লোকটি কাজ করছে ১২০০ জুল। সুতরাং, তার ক্ষমতা = (কাজের পরিমাণ)/সময় = ১২০০/৬০ = ২০ ওয়াট। সুতরাং, দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষমতা প্রথম ব্যক্তির ক্ষমতার তুলনায় দ্বিগুণ। খেয়াল করো, একজন মানুষ মোট কতটুকু কাজ করল, তার ওপর কিন্তু ক্ষমতা নির্ভর করে না, বরং নির্ভর করে সময়ের সঙ্গে কাজ করার হারের ওপর।

শক্তি (Energy)

স্কুলের দৌড় প্রতিযোগিতায় পিয়াল আর লিপি একসঙ্গে দৌড়াতে শুরু করল। অর্ধেক কিলোমিটার যাওয়ার পর পিয়াল বসে পড়ল, সে আর দৌড়াতে পারছে না। বাকি আধ কিলোমিটার লিপি একাই দৌড়ে গেল। কে বেশি শক্তিশালী? নিঃসন্দেহে বলা যায় লিপি।

দৌড়ানোর সময় দুজনেই কাজ করেছে কিন্তু অর্ধেক পথ যাওয়ার পর পিয়াল হাঁপিয়ে গেছে অর্থাৎ বিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে কাজ করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু লিপির সামর্থ্য তখনো রয়েছে। তাই সে বাকি আধা কিলোমিটার পথ দৌড়াতে পেরেছে। কাজ করার এই সামর্থ্যকেই শক্তি বলে। শক্তি যার যত বেশি, সে তত বেশি কাজ করতে পারে। কাজের পরিমাপ দিয়েই শক্তির পরিমাপ করা হয়। সুতরাং, কাজের এককই শক্তির একক এবং সেটি হচ্ছে জুল।

শক্তির নানা রূপ আমরা দেখি, যেমন:

রাসায়নিক শক্তি: দুই বা ততোধিক রাসায়নিক দ্রব্য পরস্পরের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, সেটাই রাসায়নিক শক্তি। যেমন: ব্যাটারি সেল ও ব্যাটারি।

আলোকশক্তি: বলো তো আমরা কোনো বস্তু কীভাবে দেখি? যখন কোনো বস্তু থেকে আলো ঠিকরে এসে আমাদের চোখে পড়ে, তখনই আমরা তাকে দেখতে পাই। এই আলোও কিন্তু শক্তির একটি রূপ। আলোকশক্তির ফলেই আমরা সবকিছু দেখতে পাই। সূর্য থেকে প্রাপ্ত আলোকশক্তি গাছের খাদ্য তৈরিতে সরাসরি ব্যবহৃত হয়।

শব্দশক্তি: স্কুলের ঘণ্টা বাজার সময় একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? ঘণ্টায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করার কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত শব্দটা কানে বাজতে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। কেন, বলো তো?

নিজে করি

একটা ছোট্ট পরীক্ষা করি, এসো। একটা ঘণ্টা আর একটা হাতুড়ি নাও। এবার হাতুড়ি দিয়ে ঘণ্টায় সজোরে আঘাত করে সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাটি হাত দিয়ে স্পর্শ করো– শব্দটা সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কি? কেন, বলো তো? যখন কোনো কিছুর সাহায্যে কোনো একটি বস্তুতে কম্পনের সৃষ্টি করা হয়, তখনই শব্দ তৈরি হয়। কম্পন থেমে গেলে শব্দও থেমে যায়। ঘণ্টায় আঘাত করার পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত ঘণ্টাটি কাঁপতে থাকে। সে জন্যই আমরা শব্দটা টানা কিছুক্ষণ শুনতে পাই, তুমি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে এর কম্পন থেমে গেছে, কাজেই শব্দটা আর শুনতে পাওনি!

গিটারের একটি তার যখন শব্দ সৃষ্টি করে, একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, তারটি ভীষণভাবে কাঁপছে এবং ওই কম্পনশীল তারের গায়ে স্টিল বা পিতলের গ্লাস স্পর্শ করালে দেখা যাবে, সেটি থেকে কম্পনের আওয়াজ বের হচ্ছে, যা খুব শিগগির মৃদু হয়ে যায়। এমনকি আমরা যে কথা বলি সেই শব্দও উৎপন্ন হয় আমাদের স্বরযন্ত্রের কম্পনের মাধ্যমে! বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, হুইসেল এবং বিভিন্ন জীবিত প্রাণীর আওয়াজও এই শব্দশক্তির উৎস।

বিদ্যুৎ শক্তি: শক্তির এই রূপের সঙ্গে আমরা সবাই খুব পরিচিত, তাই না? আমাদের ঘরের টিভি, ফ্রিজ, মোবাইল ফোন– সবকিছুই চলে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে। রাসায়নিক শক্তির উদাহরণ হিসেবে আমরা আগে ব্যাটারির কথা জানলাম। ব্যাটারির রাসায়নিক শক্তি আমরা কীভাবে ব্যবহার করি, বলো তো? ব্যাটারির রাসায়নিক শক্তি যখন বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তখনই আমরা এই শক্তির মাধ্যমে রেডিও, টর্চ লাইট বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করি। এখন কথা হচ্ছে, এই বিদ্যুৎ শক্তি আসে কোথা থেকে?

পরমাণু ভাঙলে আরও ছোট ছোট কিছু কণা পাওয়া যায়, এই কণাগুলোর একেকটির বৈশিষ্ট্য একেক রকম। এদের মাঝে একটি কণার নাম ইলেকট্রন, এই ইলেকট্রনের গতিশীলতা থেকেই আমরা বিদ্যুৎ শক্তি পাই।

জানো কি?

আমরা সাধারণ যে বৈদ্যুতিক বাল্ব ব্যবহার করি, তাতে বেশির ভাগ বিদ্যুৎ শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং খুব অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ আলোকশক্তিতে পরিণত হয়, অর্থাৎ আমাদের কাজে লাগে। ফলে অনেক শক্তির অপচয় ঘটে। অন্যদিকে এনার্জি সেভিং বাল্ব খুবই কম তাপ উৎপাদন করে। ফলে অল্প বিদ্যুতে অনেক আলো দেয়। দেখা গেছে, সাধারণ বাল্বের বদলে এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করলে প্রায় ৭৫ শতাংশ বিদ্যুৎ খরচ কমানো যায়!

সাধারণ বাল্ব এনার্জি সেভিং বাল্ব

শক্তির অবিনাশিতাবাদ সূত্র

এই সূত্রের মূল কথা হচ্ছে, শক্তি তৈরিও করা যায় না, আবার একে ধ্বংসও করা যায় না। তাই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মোট শক্তির পরিমাণ একই থাকে। শক্তির অনেক রূপ আছে বলে শক্তিকে অন্য রূপে পরিবর্তন করা যায়। যেমন; জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে পানির গতিশক্তি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি এবং বৈদ্যুতিক শক্তির রূপান্তরের মাধ্যমে আলোকশক্তি, তাপশক্তি, শব্দশক্তি প্রভৃতি পাওয়া যায়।

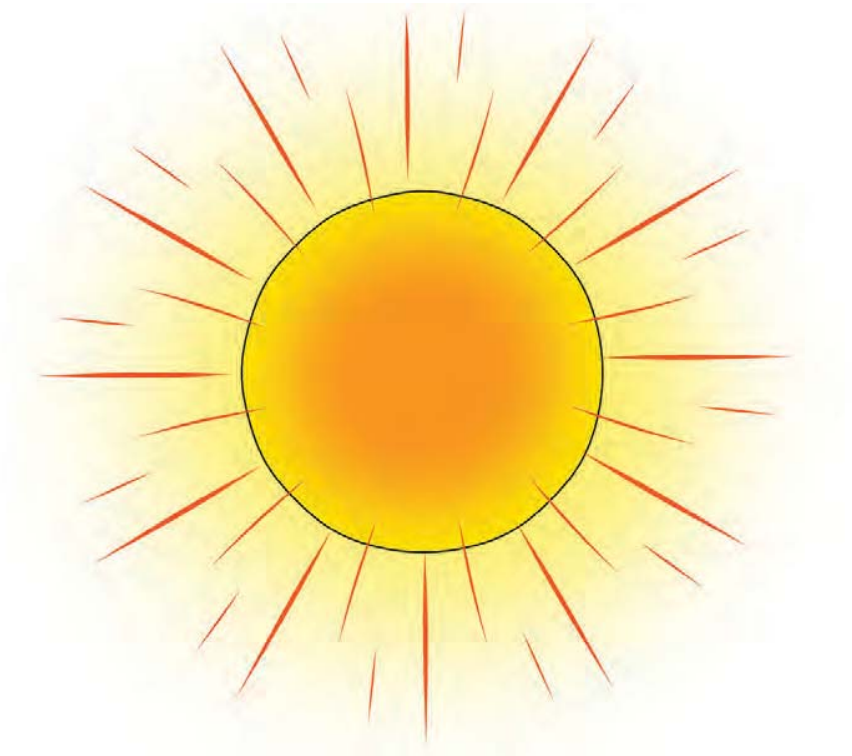

নবায়নযোগ্য ও অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস

নবায়নযোগ্য শক্তি বলতে আমরা কী বুঝি? যদিও জগতের সব শক্তির মোট পরিমাণ একই থাকে, অর্থাৎ শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস বা সৃষ্টি করা যায় না; কিন্তু শক্তির এই রূপান্তর সব সময় সম্ভব নয়, কিছু ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব। তাই শক্তির উৎস ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনায় নেওয়ার প্রয়োজন আছে। শক্তির কিছু উৎস ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হওয়ার ভয় নেই। যেমন– সূর্যের আলো আমরা কখনোই ব্যবহার করে শেষ করে ফেলতে পারব না। এ ধরনের উৎস থেকে পাওয়া শক্তিকে আমরা বলি নবায়নযোগ্য শক্তি। অপরদিকে শক্তি উৎপাদন করতে আমরা যে মাটির নিচের গ্যাস বা জ্বালানি তেল বা কয়লা ব্যবহার করি, তার ভাণ্ডার কিন্তু অফুরন্ত নয়! এসব শক্তির উৎসকে বলা হয় অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস।

শক্তির উৎস

চলো, শক্তির কয়েকটি উৎস সম্পর্কে জেনে নিই–

বায়ুশক্তি

কৃত্রিমভাবে বিদ্যুৎ তৈরির যন্ত্র টারবাইনে ব্লেডের সাহায্যে বায়ুর গতিশক্তি আহরণ করা হয় এবং তা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। তোমরা নিজেও ছোট্ট পরীক্ষার মাধ্যমে বায়ুশক্তির পরীক্ষা দেখতে পারো।

নিজে বানাই

খুব সহজেই আমরা চিত্রের মতো করে কাগজ কেটে ভাঁজ করে কোনো বাঁশের কঞ্চির আগায় পেরেক বা আলপিন দিয়ে আটকে চরকা তৈরি করতে পারি! এবার বাতাস যেদিকে যাচ্ছে, সেদিকে চরকাটা খাড়াভাবে ধরে দেখো, কী মজার ব্যাপার হয়!

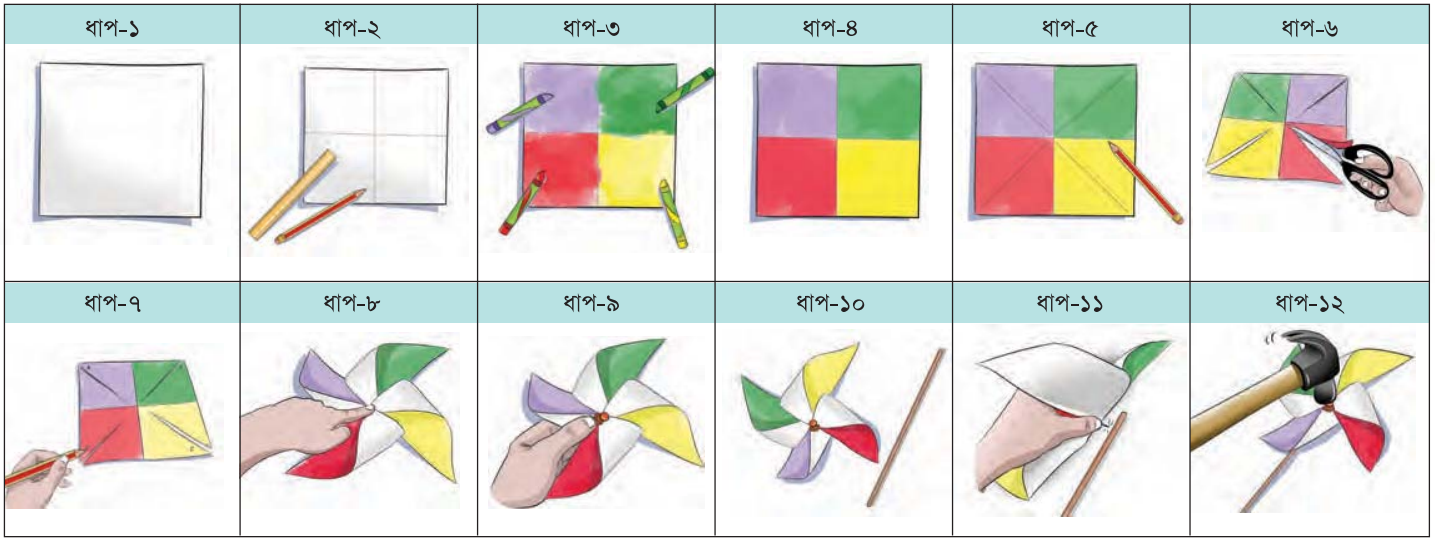

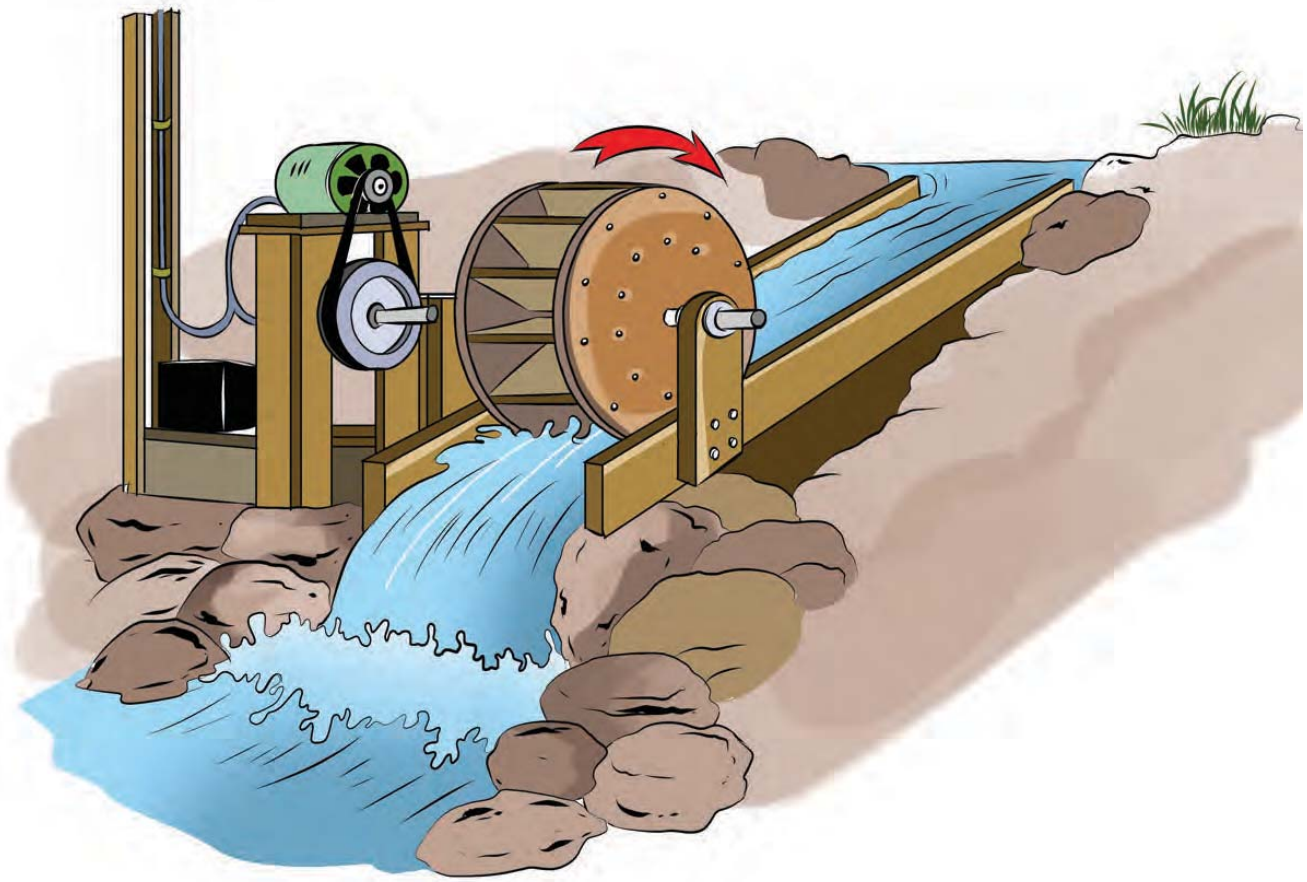

পানির গতিশক্তি

পানির গতিশক্তিকে আমরা হাইড্রো-পাওয়ার হিসেবেও জানি। কোনো প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম জলাধার বা খাড়া জলপ্রপাত থেকে তীব্র গতিতে বয়ে আসা পানির গতিশক্তিকে এখানে কাজে লাগানো হয়। এটা একটা টারবাইনের ব্লেডগুলোকে ঘোরানোর কাজে ব্যবহার করা হয় এবং এভাবে পানির গতিশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তি ও পরে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয়।

নিজে করি

খুব সহজেই তোমরা পানির গতিশক্তি পরীক্ষা করে দেখতে পারো। এক টুকরা কর্কশিট গোল সিলিন্ডারের আকৃতিতে কেটে ছবির মতো এর চারদিকে শক্ত কাচ, প্লাস্টিক বা কার্ডবোর্ডের ভাঙা টুকরা গেঁথে টারবাইনের পাখার মতো বানাও। কর্কশিটের সিলিন্ডারের ভেতরে মধ্যখানে লম্বা বরাবর চওড়া ছিদ্র করে একটা সরু কাঠি ঢুকিয়ে এটিকে কোনো স্ট্যান্ড দিয়ে ছবির মতো ঝুলিয়ে রাখো। এবার একটা প্লাস্টিকের মিনারেল ওয়াটারের বোতলের নিচের দিকে ছিদ্র করে স্কচটেপ দিয়ে আটকে দাও। বোতলে পানি ভর্তি করে টারবাইন যেখানে রাখা তার চেয়ে একটু উঁচু জায়গায় বোতলটি রাখো। ছিদ্রের মুখটা থাকবে টারবাইনের পাখার ঠিক ওপর বরাবর। এবার ছিদ্রের মুখটা খুলে দাও, দেখো, পানি ওপর থেকে টারবাইনের পাখার ওপর পড়লে কী মজার ব্যাপার হয়! কী দেখছ?

পাখাগুলো ঘুরছে, তাই না? পানির গতিশক্তি টারবাইনে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হচ্ছে!!

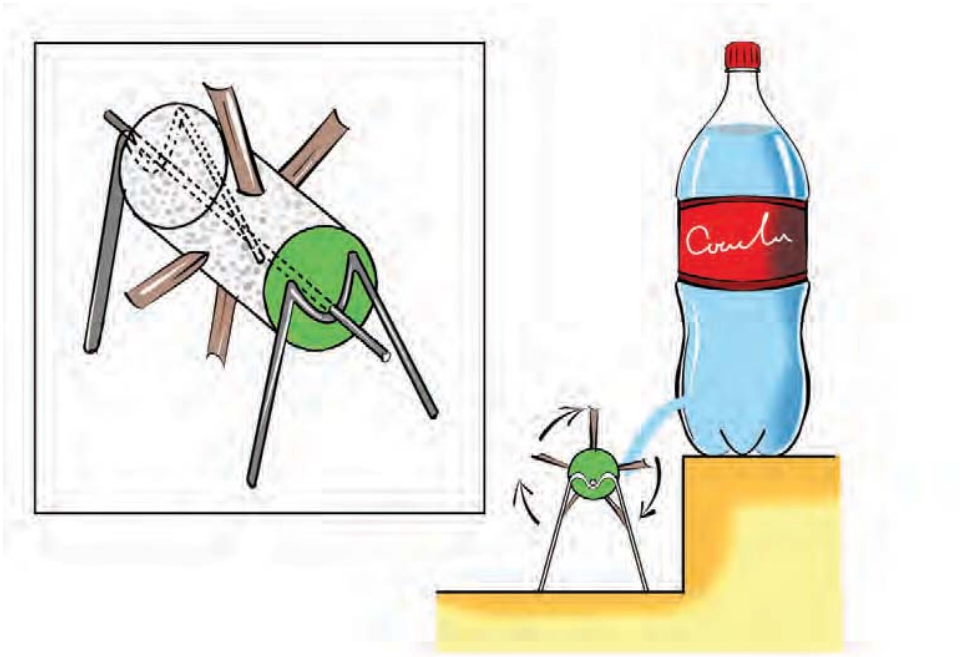

বলো তো দেখি?

বোতলটি যদি আরও উঁচু জায়গায় রাখা হয়, টারবাইনের ঘূর্ণনে কোনো পরিবর্তন হবে কি? হলে তা কেন হবে?

সৌরশক্তি: সূর্য আমাদেরকে তাপ ও আলোকশক্তি দিয়ে থাকে। এই শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ এবং আরও তাপ উৎপন্ন করা যায়। পাশের ছবিতে টিনের চালে যে চৌকোনা প্যানেলটি দেখছ, তা সৌরশক্তি সঞ্চয় করতে ব্যবহার করা হয়। এ জন্য একে সোলার প্যানেল বলে। ইদানীং অনেক বাড়ির ছাদে দেখবে এ ধরনের প্যানেল বসানো থাকে। এই সোলার প্যানেল সূর্যের আলো শোষণ করে এবং এই সৌরশক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে। এই বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে গৃহস্থালি বিদ্যুতের চাহিদা অনেকাংশে মেটানো যায়।

নিউক্লিয়ার শক্তি: আমরা একটু আগেই জানলাম, পদার্থের ক্ষুদ্র একক পরমাণু ভাঙলে আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েক ধরনের কণা পাওয়া যায়। পরমাণুর একদম কেন্দ্রে একসঙ্গে জড়ো হয়ে থাকে অপেক্ষাকৃত ভারী কণাসমূহ। এই কেন্দ্রকে আবার বলে নিউক্লিয়াস। একেকটা নিউক্লিয়াসকে ভাঙলে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয়, আবার একাধিক নিউক্লিয়াসকে কোনোভাবে যুক্ত করলেও একইভাবে অকল্পনীয় শক্তির উদ্ভব হয়।

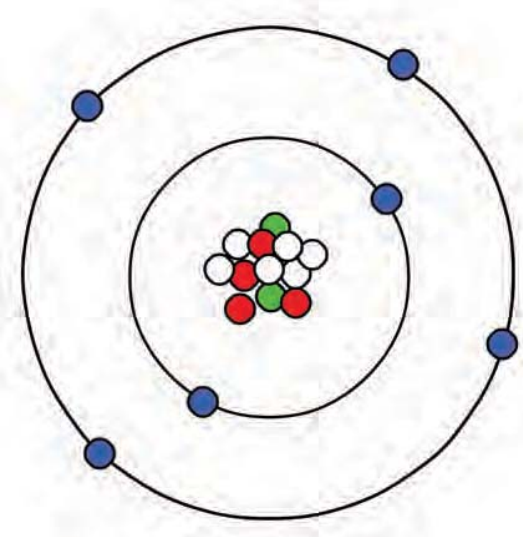

এই নিউক্লিয়ার শক্তি অদৃশ্য রশ্মির আকারে বের হয়, যাকে বলে তেজস্ক্রিয়তা। সব মৌল নয়, বরং তেজস্ক্রিয় কিছু মৌল যেমন– ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদন করা হয়। এই শক্তি কাজে লাগিয়ে স্বল্প ব্যয়ে প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব! যদিও বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই প্রক্রিয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও নানা কাজে এই তেজস্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহার আছে। যেমন– এক্স-রে একধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি, যা ব্যবহার করে চিকিৎসকেরা মানুষের শরীরের ভেতরের অনেক কিছু দেখতে পান। এ শক্তি ডুবোজাহাজে (Submarine) ব্যবহৃত হয়।

এত সব ভালো দিকের পাশাপাশি এ শক্তির অনেক ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। এই শক্তি উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় যে বর্জ্য তৈরি হয়, তাকে বলে নিউক্লিয়ার বর্জ্য, যা জীবজগতের জন্য চরম ক্ষতিকর এবং এটা শত শত বছর ধরে সক্রিয় থাকে। আবার এই শক্তি ব্যবহার করেই তৈরি হয় মানববিধ্বংসী পারমাণবিক বোমা! তোমরা কি জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি– এই শহর দুটোর নাম শুনেছ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা জাপানের উন্নত ও বিখ্যাত দুটি শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিয়ে আক্রমণ চালায়! এই আক্রমণে ওই দুটো এলাকার বিস্তীর্ণ জায়গার জীব ও জনজীবন সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এর আশপাশের জায়গাগুলোতে মানুষ বিভিন্নভাবে বিকলাঙ্গ ও অসুস্থ হতে থাকে; এমনকি নবজাতকেরাও শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন অস্বাভাবিকতা নিয়ে জন্ম নিচ্ছে, যার রেশ আজও চলছে।

বলো তো দেখি

ওপরের উৎসগুলোর মধ্যে কোনগুলো নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস আর কোন কোনটি অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস?

অনুশীলন: (নিজে করি)

নিচের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ করা হচ্ছে?

একজন ছাত্র তার বিজ্ঞান খাতায় একটি ভুল রাবার দিয়ে ঘষে তুলছে।

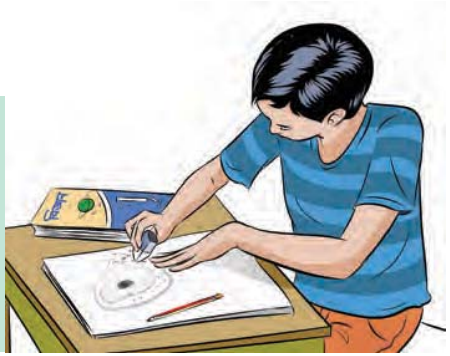

একজন ছাত্র কোনো একটি প্রশ্ন নিয়ে ভাবছে।

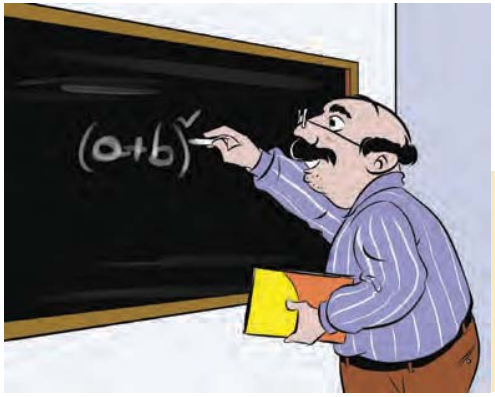

একজন শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে লিখছেন।

একজন ছাত্র মাটি থেকে বারবার লাফিয়ে ওপরে উঠছে।

একজন লোক একটি ভ্যানগাড়ি ঠেলছেন, কিন্তু সেটি নড়ছে না।

একজন লোক একটি বল গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

একজন সৈনিক একটি রাইফেল হাতে সোজা অ্যাটেনশন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন।

একজন একটা গাড়ি অনেকক্ষণ ঠেলেও সরাতে পারলেন না।

তোমার হাত ফসকে একটা বই মাটিতে পড়ে গেল।

একটা গাড়ি আস্তে আস্তে বেগ বৃদ্ধি করল।

নিচের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ করা হচ্ছে বা হচ্ছে না?

১. যখন কোনো বল প্রয়োগ করা না হয়।

২. প্রয়োগকৃত বল দ্বারা কোনো বস্তু একটুও সরল না।

৩. বল প্রয়োগ করা হলো এবং বস্তুটিও সরল, তবে বলের দিকে একটুও নয়।

কাজের পরিমাপ

১। পিয়াল তার হাতের তর্জনীর মাথায় একটি কয়েন ভারসাম্য অবস্থায় রেখে দিয়েছে। পিয়াল কি কয়েনটির ওপরে কোন কাজ করছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

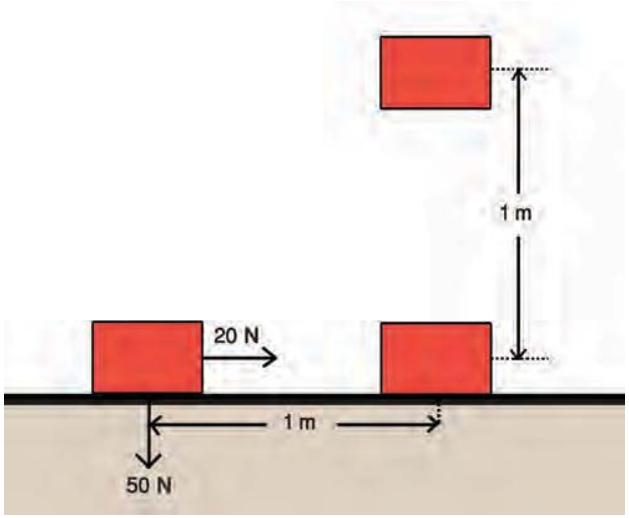

২। ৫০ নিউটন ওজনের একটি বস্তুকে ২০ নিউটন বল প্রয়োগ করে অনুভূমিকভাবে ঠেলে ১ মিটার সরানো হলো। এরপর একে ১ মিটার উঁচুতে তোলা হলো। বস্তুটির ওপর মোট কৃত কাজের পরিমাণ কত?

৩। একটি ঘাসকাটা মেশিনের ওপরে ২৫ N বল প্রয়োগ করে জামাল সেটাকে ৫ মিটার দূরে নিয়ে গেল। এর ফলে সে কী পরিমাণ কাজ করেছে?

সঠিক শব্দ বাছাই করে নিচের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করো

১. একটি রাবার ব্যান্ড টেনে ছেড়ে দেওয়ার পর আগের অবস্থায় ফিরে আসে _ _ _ _ শক্তির বলে। (স্থিতিস্থাপক= Elastic/পেশিশক্তি = Muscular)

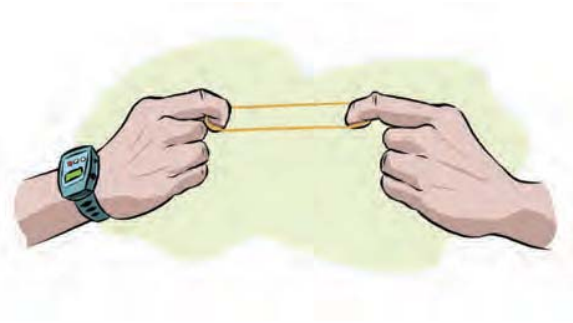

২. একটি _ _ _ _ হচ্ছে এমন একটি ছোট যন্ত্র, যার এক পাশ চোখা এবং অন্য পাশ ভোঁতা। (বল্টু/স্ক্রু)

৩. _ _ _ _ শক্তি অল্প সময়ে আবার কাজে লাগানো যায়। (নবায়নযোগ্য/অ-নবায়নযোগ্য)

৪. _ _ _ _ শক্তি একধরনের শক্তি, যা দৃশ্যমান আলোর সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কিত। (শব্দ/আলো)

সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দাও

ক. ব্যাটারিতে সংরক্ষিত শক্তি হচ্ছে

১. বৈদ্যুতিক শক্তি
২. নিউক্লিয়ার শক্তি
৩. রাসায়নিক শক্তি

খ. নিচের কোনটির একক আর ক্ষমতার একক একই?

১. বল x দূরত্ব
২. দূরত্ব x সময়
৩. কাজ x ত্বরণ
৪. বল x বেগ

গ. একজন লোক ২ মিনিটে একটা চালের বস্তা মাথায় নিয়ে দোতলায় উঠল। একই ভরের আরেকটি বস্তা নিয়ে আরেকজন ৬ মিনিটে হাঁপাতে হাঁপাতে দোতলায় উঠল। তাদের কৃত কাজের পরিমাণের ব্যাপারে নিচের কোনটি সঠিক?

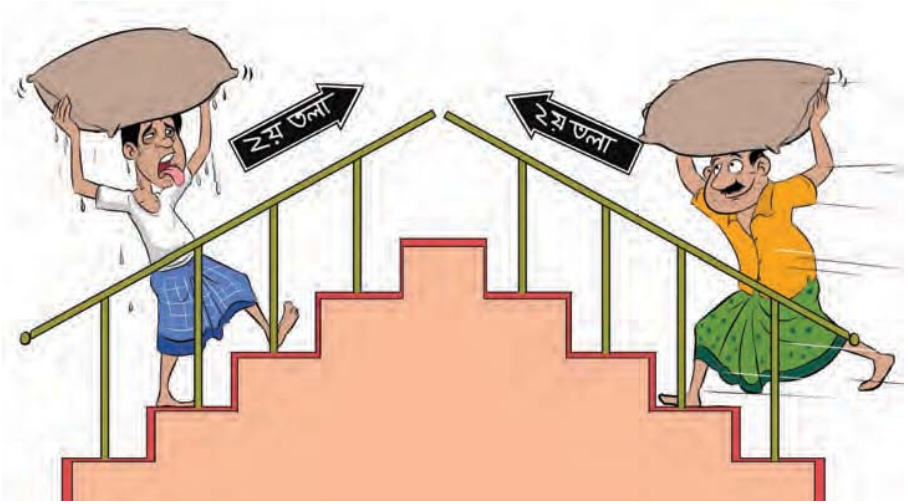

১. প্রথম জন দ্বিতীয় জনের তিন গুণ কাজ করেছে
২. দ্বিতীয় জন প্রথম জনের তিন গুণ কাজ করেছে
৩. দুজনের কাজের পরিমাণ সমান

ঘ. একটা বাচ্চা ছেলে দৌড়ে তার বাসার সামনের রাস্তা পার হয়। নির্দিষ্ট এই দূরত্ব পার হতে গিয়ে পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে এই যে কাজ, সেই কাজের পরিমাণে নিচের কোনটি কোনো প্রভাব ফেলে না?

১. ছেলেটির ভর
২. রাস্তার প্রস্থ
৩. ছেলেটির দৌড়ের বেগ
৪. পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের পরিমাণ

ঙ. ৪০০ নিউটন ওজনের একটি মেয়ে সিঁড়ি বেয়ে ৪ সেকেন্ডে ৫ মিটার উচ্চতায় উঠল। মহাকর্ষ বলের বিরুদ্ধে তার কাজের ক্ষমতা–

১. ৪০০ W
২. ৫০০ W
৩. ১০০ W
৪. ২০০০ W

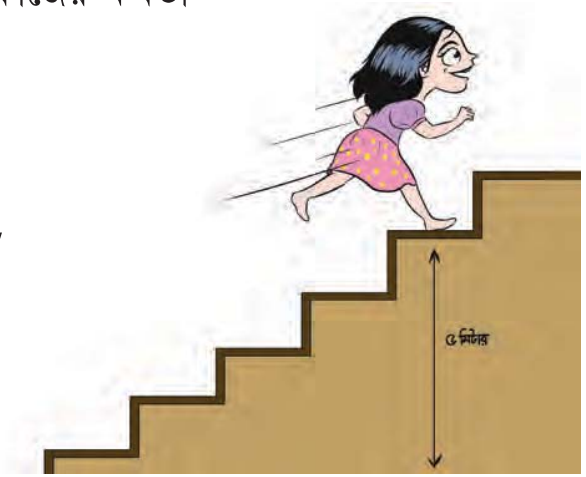

এককথায় উত্তর দাও

১. মাধ্যাকর্ষণজনিত বল কী?
২. নবায়নযোগ্য শক্তির দুটি উদাহরণ দাও।
৩. শক্তির অবিনাশিতাবাদ সূত্রটি উল্লেখ করো।

নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

১. এক ধরনের শক্তি অন্য ধরনের শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার দুটো উদাহরণ দাও।
২. সৌরশক্তির ব্যবহার কী?
৩. নিউক্লিয়ার শক্তি কাকে বলে?
৪. উইন্ডমিল আর হাইড্রোপাওয়ারের ক্ষেত্রে শক্তির রূপান্তরের মিল কী আছে, ব্যাখ্যা করো।

নিচের ক্ষেত্রগুলোতে শক্তির রূপান্তর ব্যাখ্যা করো

১. সোলার প্যানেল

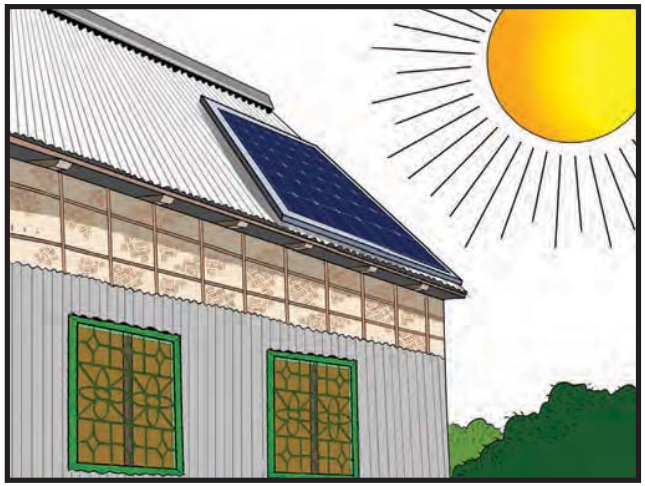

২. কলিংবেল

৪. ইস্ত্রি

৩. বৈদ্যুতিক পাখা

পঞ্চম অধ্যায়

জনসংখ্যা ও পরিবেশ (Population and our Environment)

পঞ্চম অধ্যায়

জনসংখ্যা ও পরিবেশ (Population and our Environment)

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

১। অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা অনুধাবন করতে পারব।
২। মেয়েশিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা ব্যাখ্যা করতে পারব।
৩। অশিক্ষার পরিণাম ব্যাখ্যা করতে পারব।
৪। বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হব।
৫। আমাদের আশপাশের পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে উদ্যোগী হব।
৬। বায়ুদূষণ রোধ করার চেষ্টা করব এবং আশপাশের মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলব।
৭। বেশি বেশি গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করব এবং বৃক্ষরোপণে সচেষ্ট হব।
৮। পানির অপচয় রোধ করতে সক্রিয় হব। নিজেদের পাড়া-মহল্লার মানুষকেও এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলব।
৯। আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানব। তিন কলসি পদ্ধতি ব্যবহার করে পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা কমাতে পারব।
১০। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণে উদ্যোগী হব।
১১। নিজেদের এলাকার পানির উৎসসমূহ দূষণমুক্ত রাখতে সচেষ্ট হব।

এ অধ্যায়ে কী শিখব

i) জনসংখ্যা সমস্যা, ii) লিঙ্গবৈষম্যের পরিণাম, iii) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুফল, iv) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, v) পরিবেশদূষণ, vi) বায়ুদূষণ, vii) গ্রিনহাউজ ইফেক্ট, viii) ওজোন স্তর রক্ষা, ix) পানিদূষণ, x) আর্সেনিক, xi), বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, xii) পানির অপচয় রোধ, xiii)পানির উৎস রক্ষা।

গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হয়ে গেছে। পিয়াল আর লিপির পরীক্ষাও শেষ হয়েছে ছুটির আগেই। পড়ার চাপ নেই বললেই চলে। একে তো ছুটি, তার ওপর দুপুরে খাবারের পর কাজ নেই তেমন; গল্পের বই পড়ার জন্য আদর্শ সময়! এমনই এক অলস দুপুরে দুই ভাইবোন বসে গল্পের বই পড়ছিল। আসমা নামের একটি মেয়ের জীবনের গল্প...

আসমা রংপুরের মেয়ে। কিছুদিন আগ পর্যন্ত সে রংপুরেই স্থায়ীভাবে বাস করত। ওর বাবা পেশায় দিনমজুর কৃষক। বয়স খুব বেশি না হলেও অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য তাঁকে বেশ বয়স্ক দেখায়।

আসমারা মোট ছয় ভাইবোন। আরও দুই ভাই জন্মের সময় মারা গেছে। পরে ডায়রিয়ায় মারা যায় আরও এক বোন, তিন বছর বয়সে। জীবিত ছয় ভাইবোনের মধ্যে ওই সবার বড়।

এককালে ওদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা বেশ ভালোই ছিল। ওর দাদার বাবা ছিলেন গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন কৃষক। বেশ ভালোই জমিজমা ছিল তাঁর। গ্রামে সবাই তাঁর কথা বেশ মানত। আসমার দাদারা ছিলেন আট ভাই। তাঁদের বাবা মারা যাওয়ার পর পুরো সম্পত্তি তাঁরা সমান ভাগে ভাগ করে নিলেন। আট ভাগের মাত্র এক ভাগ সম্পত্তি পাওয়ায় এসব ভাইয়ের আর্থিক অবস্থা একটু খারাপ হয়ে যায়।

আসমার দাদার পরিবারে অভাব ছিল না, কিন্তু অবস্থা যে খুব একটা ভালো ছিল, তাও নয়। ১০ ছেলেমেয়েকে বড় করতে তাঁর বেশ কষ্ট হয়েছে! তাঁর পরিবারে নুন আনতে পান্তা ফুরায়– এমন দশা ছিল না, কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার সময় সামান্য কিছু জায়গা-জমি ছাড়া ছেলেমেয়েদের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর পর আসমার বাবারা ১০ ভাইবোন সেই সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার পর একেকজনের ভাগে তেমন কিছুই রইল না!

আসমার বাবার নিজের বলতে সামান্য এক টুকরো ভিটেবাড়ি, পাশে অল্প একটু চাষের জমি। তা থেকে যা আয় হয়, তাতে তাঁর এত বড় সংসার চালানো মোটেই সম্ভব নয়। তাই অন্যের জমিতে দিনমজুর খেটে তাঁর কোনোরকমে দিন চলে। আসমা যদিও পড়ালেখা করেনি, তার পিঠাপিঠি ছোট ভাই রনি অবশ্য স্কুলে যেত। সত্যি বলতে, দুই ভাইবোনের পড়ালেখার খরচ মেটানো তার বাবার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

অল্প বয়সেই আসমাকে ঢাকায় একজনের বাসায় কাজ করতে নিয়ে আসা হয়। কয়েক বছর মানুষের বাসায় কাজ করার পর একজন বুদ্ধি দিল আসমাকে গার্মেন্টসে কাজ নিতে। বাসাবাড়িতে কাজ করতে আসমার অনেক কষ্ট হতো। একেক বাসার মালিকের ব্যবহার ছিল ভীষণ খারাপ; অনেকে তো মারধরও করত! তার ওপর মাস শেষে যা সামান্য টাকা পেত, তাতে গ্রামে বাবা-মাকে তেমন কিছুই পাঠানো যেত না। কাজেই আসমা একসময় একটা গার্মেন্টসে কাজ নিল।

গার্মেন্টসে অসম্ভব পরিশ্রম করেও আসমা যে বেতন পায়, তা খুব বেশি নয়। কিন্তু পড়ালেখা যেহেতু করেনি, আসমার সামনে এ ছাড়া অন্য কোনো চাকরি করার উপায় ছিল না। সে থাকে একটা বস্তিতে ছোট একটা ঘর নিয়ে, স্বামী ও তিন সন্তান নিয়ে তার এখনকার সংসার। তার স্বামী পেশায় সিএনজিচালক।

বস্তির যে ঘরটিতে আসমা ও তার স্বামী-সন্তানেরা এখন থাকে, তা মোটেও পাঁচজনের থাকার মতো বড় নয়। কিন্তু ঢাকা শহরে এর চেয়ে বড় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব; বরং এই ছোট্ট ঘরের ভাড়া দিয়েই তাদের দুজনের উপার্জনের অনেকটাই খরচ হয়ে যায়।

বস্তির পরিবেশ বিশ্রী রকম নোংরা, পানির ব্যবস্থা নেই। প্রতিদিন সকালে একটা মাত্র ট্যাপ থেকে লাইন দিয়ে সবার পানি নিয়ে আসতে হয়। কয়েকটা পরিবারের জন্য একটা নামমাত্র টয়লেট। নোংরা পরিবেশে বেড়ে ওঠা আসমার সন্তানেরা প্রায় সারা বছরই ডায়রিয়াসহ নানা রোগে ভোগে। তাদের খাওয়া-দাওয়া কিংবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় ওরা স্বামী-স্ত্রী কেউই পায় না। তিন সন্তানের কেউই স্কুলে যায় না, বস্তির অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই খেলাধুলা করে ওদের সারা দিন কাটে।

হাজারো সমস্যার ভিড়ে ইদানীং আর গ্রামে যাওয়া হয় না ওদের। হুট করেই গত ঈদের সময় ওরা সিদ্ধান্ত নেয় রংপুরে আসমার গ্রামে যাওয়ার। যেই ভাবা সেই কাজ, ঈদের সময় ঢাকা শহরের লাখ লাখ মানুষের সঙ্গে ওরাও রওনা দেয় নিজ গ্রামের দিকে।

গ্রামে গিয়েই এবার একটা পরিবর্তন লক্ষ করে আসমা। ওদের বাড়িটা বেশ পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে, অবস্থাও আগের চেয়ে ভালো মনে হচ্ছে। বাড়ির পাশের ছোট্ট জায়গাটায় অল্প কয়েকটা সবজিগাছ বেশ সতেজ হয়ে বেড়ে উঠেছে।

আসমার আরও দুই বোনের অন্য গ্রামে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় বাড়িতে এখন থাকে ওর এক বছরের ছোট ভাই রনি, আর ভাইবোনদের মধ্যে সবার ছোট দুজন– সুমি ও মিঠু। আসমা অবাক হয়ে খেয়াল করল, ওদের দুজনেরই স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে! দুজনের গায়েই পরিষ্কার জামা, পায়ে স্যান্ডেল। অথচ কদিন আগেও ওদের রোগা মুখের দিকে তাকানো যেত না! ওর বাবা-মা দুজনেই এখন প্রৌঢ়। রনি আর তার স্ত্রী রেহানার ওপরেই বাড়ি দেখাশোনার পুরো ভার। হঠাৎ বাড়ির এত উন্নতি কী করে হলো! ভেবে পায় না আসমা।

আস্তে আস্তে সব জানতে শুরু করে সে। রনি ক্লাস এইট পর্যন্ত গ্রামের একটা স্কুলেই পড়াশোনা করেছিল। এরপর সেই স্কুলেরই এক শিক্ষকের পরামর্শে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মাছ চাষ এবং উৎপাদন বিষয়ে এসএসসি ও এইচএসসি পর্যন্ত লেখাপড়া করে। এইচএসসি শেষ করেই ও গ্রামের আরও কয়েকজন বেকার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের একজন অবস্থাসম্পন্ন লোকের পুকুর ইজারা নেয় এবং মাছের চাষ শুরু করে। যথাযথ ট্রেনিং থাকায় খুব অল্প দিনের মধ্যেই তারা লাভের মুখ দেখতে শুরু করে। আসমাদের বাড়ির চেহারাও বদলাতে শুরু করে তখন থেকেই।

রনির স্ত্রী রেহানাও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অধীনে সেলাইয়ের ট্রেনিং নিয়ে এসএসসি ও এইচএসসি পাস করে। গ্রামের মহিলাদের সমবায় সমিতি থেকে ঋণ নিয়ে একটা সেলাই মেশিন কিনেছে সে। এখন সে আশপাশের অনেক বাড়ির মানুষের জামাকাপড় সেলাই করে। নিজের উপার্জনের টাকা দিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই সে ওই ঋণ শোধ করে দিয়েছে। রনি আর রেহানার যে আয়, তাতে ওদের পরিবার এখন গ্রামের বেশ সচ্ছল পরিবারগুলোর মধ্যে একটি! তাদের একমাত্র সন্তান রানুর বয়স এখন ছয় মাস।

আসমার ছোট দুই ভাইবোন সুমি, মিঠু এখন স্কুলে যায়। গেল বছর সুমি ক্লাস সিক্সে ফার্স্ট হয়েছে! এর মধ্যেই বাড়িতে ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে সে, ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়েই ছাড়বে! তাহলে আর বাবা-মাকে ডাক্তার দেখাতে শহরে যেতে হবে না!

বাড়ির এত ভালো অবস্থা দেখে মন ভালো হয়ে যায় আসমার। ওর বাচ্চারাও খুশি, বস্তির ঘিঞ্জি অবস্থা থেকে এই ছিমছাম গ্রামে এসে ওরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায়! কিন্তু এসব কিছুর ফাঁকেও একটু মন খারাপ হয় আসমার। আজ ও যদি পড়াশোনা করত বা এই ধরনের কোনো ট্রেনিং নিত, তাহলে ওর জীবনটাও অন্য রকম হতে পারত! ওর বাচ্চারাও একটা সুন্দর পরিবেশে বেড়ে উঠত!

চলো, আমরা দেখি, কী ভুলের জন্য আসমার জীবনটা এ রকম হলো

তোমরা সবাই দুই দলে ভাগ হয়ে যাও। প্রথম দল 'ক' ছকে নোট করো, আসমার বাবার দরিদ্র হয়ে যাওয়ার কারণ কী কী? আসমার জীবনে বড় ভুল কী ছিল? দ্বিতীয় দল 'খ' ছকে নোট করো, আসমার ভাই রনির জীবনে সাফল্যের প্রধান কারণ কী কী?

এবার চলো, সবাই মিলে আলোচনা করে 'গ' ছক পূরণ করি। সব বাধা কাটিয়ে আসমা কীভাবে জীবনে ঘুরে দাঁড়াতে পারে এবং তার অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে?

ক	খ	গ
১	১	১
২	২	২
৩	৩	৩
৪	৪	৪
৫	৫	৫

এতক্ষণ তো আমরা আসমার গল্প শুনলাম। এবার আমাদের চারপাশের দিকে একটু তাকাই।

তোমরা কি জানো, বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর হলো ঢাকা?

আসমা যেই বস্তিতে থাকত, সে রকম বস্তি কিন্তু আমরা শহরাঞ্চলে হরহামেশাই দেখি। এমনকি অনেক মানুষকে ঢাকা শহরে দিনের পর দিন পাইপের মধ্যেও বসবাস করতে আমরা দেখেছি। বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে চাকরির সুযোগ কম থাকায় প্রতিদিন আসমার মতো হাজার হাজার মানুষ গ্রাম থেকে এই শহরে এসে পাড়ি জমায়। অথচ শহরের আয়তন কিন্তু যা ছিল তাই আছে। কাজেই ঢাকা শহরে জনসংখ্যা বেড়ে গেছে আশঙ্কাজনকভাবে। অথচ একটু উদ্যোগী হলে গ্রামেও রনির মতো নিজের উপার্জনের ব্যবস্থা নিজেই করা সম্ভব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাবে গ্রামের তরুণ-তরুণীরা আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়।

পরিবেশদূষণ

আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। এই পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদেরই দায়িত্ব। অথচ অসচেতনতাবশত আমরা হরহামেশাই পরিবেশ দূষিত করে চলেছি। আসমার গল্পে আমরা দেখেছি, বস্তির দূষিত পরিবেশের জন্য আসমার ছেলেমেয়েরা কীভাবে টানা অসুস্থ থাকে। বায়ু, পানি– এসবই পরিবেশের একেকটি উপাদান। চলো, আমরা এই উপাদানগুলো কীভাবে দূষিত হয় দেখি।

বায়ুদূষণ

নিচের ছবিতে লিপি আর পিয়ালকে দেখো, ওরা নাকে রুমাল চাপা দিয়ে আছে কেন?

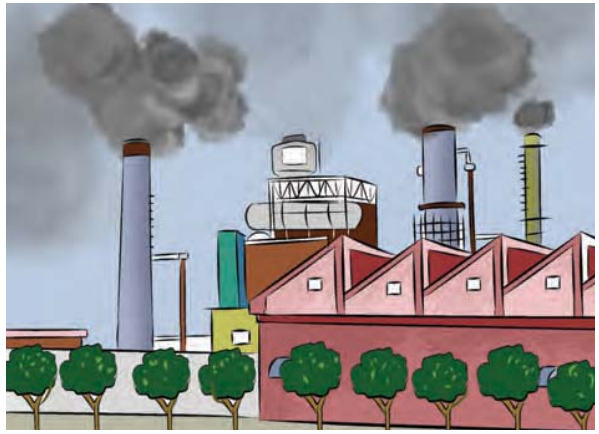

দুর্গন্ধের জন্য, তাই না? এভাবে যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেললে বা মলমূত্র ত্যাগ করলে দুর্গন্ধ ছড়ায়। বায়ুদূষণের একটা বড় কারণ হলো এই দুর্গন্ধ। আবার ধূমপানের ফলেও বিষাক্ত ধোঁয়া বাতাসে মেশে। এর ফলেও দূষণ হয়। এ ছাড়া কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া, ইটের ভাটা, যানবাহনের কালো ধোঁয়া ইত্যাদিও বায়ুকে দূষিত করে। যেখানে-সেখানে কফ, থুতু ইত্যাদি ফেললে রোগ-জীবাণু বাতাসে ছড়ায়, বায়ুবাহিত রোগ দেখা দেয়। দূষিত বায়ু গ্রহণে অনেক ভয়ংকর রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। যেমন– অ্যালার্জি, কাশি, হাঁচি, ব্রংকাইটিস, উচ্চ রক্তচাপ, এমনকি ফুসফুসের ক্যানসার পর্যন্ত!

বায়ুদূষণ কমানো যায় কীভাবে?

বায়ুদূষণ কীভাবে হয়, তা মনে রাখলেই বায়ুদূষণ কমানো যায় অনেকাংশে। যেমন–

১। যেখানে-সেখানে ময়লা না ফেলা

২। কালো ধোঁয়া নির্গমনকারী ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ

৩। গাছ লাগানো ও বনভূমি সংরক্ষণ

৪। পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহার ইত্যাদি

রঙিন ডাস্টবিনের রহস্য!

তোমরা যারা শহরে থাকো, বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক, শপিং সেন্টারে গেলে ময়লা ফেলার জন্য ডাস্টবিন রাখা থাকে, লক্ষ করেছ? অনেক সময় দেখবে, পাশের ছবির মতো পাশাপাশি বিভিন্ন রঙের ডাস্টবিন সাজানো থাকে। এ রকম বিভিন্ন রঙের ডাস্টবিন ব্যবহারের কারণ কি কেউ বলতে পারো?

বর্তমানে, বিশেষত শহরাঞ্চলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আমাদের ভীষণ মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শহরে মানুষ বেড়ে চলেছে, বেড়েছে বাড়িঘর, যানজট আর সেই সঙ্গে আবর্জনা। উন্নত দেশগুলোতে এখন আবর্জনা ফেলে পরিবেশ দূষণ না করে বরং তা সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এ নিয়ে হচ্ছে হরেক গবেষণাও। সেই গবেষণার ফলে বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তার অনেক উপায় পাওয়া গেছে। যেমন–প্লাস্টিক বা পলিথিন জাতীয় দ্রব্য গলিয়ে আবার নতুন প্লাস্টিকজাত দ্রব্য তৈরি করা সম্ভব। একইভাবে নতুন দ্রব্য তৈরিতে কাজে লাগানো যায় টিন, অ্যালুমিনিয়াম বা অন্যান্য ধাতুর তৈরি ক্যান, কৌটা বা বোতলও। আবার ফেলে দেওয়া খাবার, রান্নার বর্জ্য– এসব পচনশীল আবর্জনা জ্বালানির কাজে; যেমন– বায়োগ্যাস উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় নিশ্চিন্তে! কিন্তু বর্জ্য থেকে নতুন করে কিছু উৎপাদন করতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন এই বিভিন্ন রকম বর্জ্য আলাদা করা, যেটা ব্যাপক সময়সাপেক্ষ। এই ঝামেলা এড়ানোর সহজ উপায় কী?

ঠিক ধরেছ! আমরা যদি ময়লা-আবর্জনা ফেলার সময়েই বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা আলাদা করে ফেলি, তাহলে এই কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়! এ কারণেই ইদানীং অনেক জায়গাতেই এ রকম বিভিন্ন রঙের ডাস্টবিনের ব্যবহার বেড়েছে। বিভিন্ন রং ব্যবহারে সুবিধা হচ্ছে, এতে চট করেই বোঝা যায়, কোনটিতে কোন ধরনের বর্জ্য ফেলতে হবে!

বায়োগ্যাস

আমরা একটু আগেই বলছিলাম, যে বিভিন্ন পচনশীল আবর্জনা ব্যবহার করে জ্বালানি উৎপাদন সম্ভব! 'বায়োগ্যাস' শব্দটার সঙ্গে কি তোমরা পরিচিত?

বিভিন্ন পচনশীল জৈব পদার্থ বা জীবজ বর্জ্য পদার্থ, যেমন– মানুষের মলমূত্র, গরু-ছাগলের গোবর, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা, গৃহস্থালির বর্জ্য ইত্যাদি বাতাসের অনুপস্থিতিতে পচনের ফলে যে গ্যাস তৈরি করে, তাকে বায়োগ্যাস বলে।

বহু বছর ধরে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে রান্নাবান্নার কাজে কাঠ, খড়ি, খড়কুটা, নাড়া, শুকনা গোবর– এগুলো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানির চাহিদাও বেড়েছে। জ্বালানি হিসেবে প্রচুর কাঠ ব্যবহারের ফলে গাছপালা উজাড় হয়ে যাচ্ছে। ফলে আমরা একে তো আমাদের বনজ সম্পদ হারাচ্ছি, তার ওপর আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে ঠেলে দিচ্ছি এক ভয়াবহ অবস্থার দিকে। অন্যদিকে গোবর এবং অন্যান্য পচনশীল পদার্থ পুড়িয়ে ফেলার কারণে আবাদি জমি জৈব সার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ক্রমাগত রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে পরিবেশদূষণ ক্রমশই বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এই সংকট মোকাবিলায় বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বায়োগ্যাস একটি কার্যকর সমাধান।

জানো কি?

তোমরা কি কেউ বলতে পারো, বর্তমানে প্রতিবছর দেশে কী পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন?
প্রায় তিন কোটি ৯০ লাখ মেট্রিক টন!

কীভাবে কাজ করে?

পাশের ছবিতে একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছ?

মানুষ ও পশুপাখির মলমূত্র, এ ছাড়া গৃহস্থালি বর্জ্য এবং পানি পাইপ দিয়ে নিচের ট্যাংকে জমা হয়। এখানে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে বর্জ্য পচে মিথেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ বিভিন্ন গ্যাস নির্গত হয়। ওপরে গ্যাস নির্গমন পাইপ দিয়ে সেই গ্যাস সংগ্রহ করা হয়।

এই গ্যাস রান্নাসহ বিভিন্ন গৃহস্থালি কাজ, এমনকি বিদ্যুৎ উৎপাদনেও ব্যবহার করা যায়! অন্য একটি সংগ্রাহক পাইপ দিয়ে আরেকটি ট্যাংকে উপচে পড়া বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে ব্যবহৃত বর্জ্য পরে জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

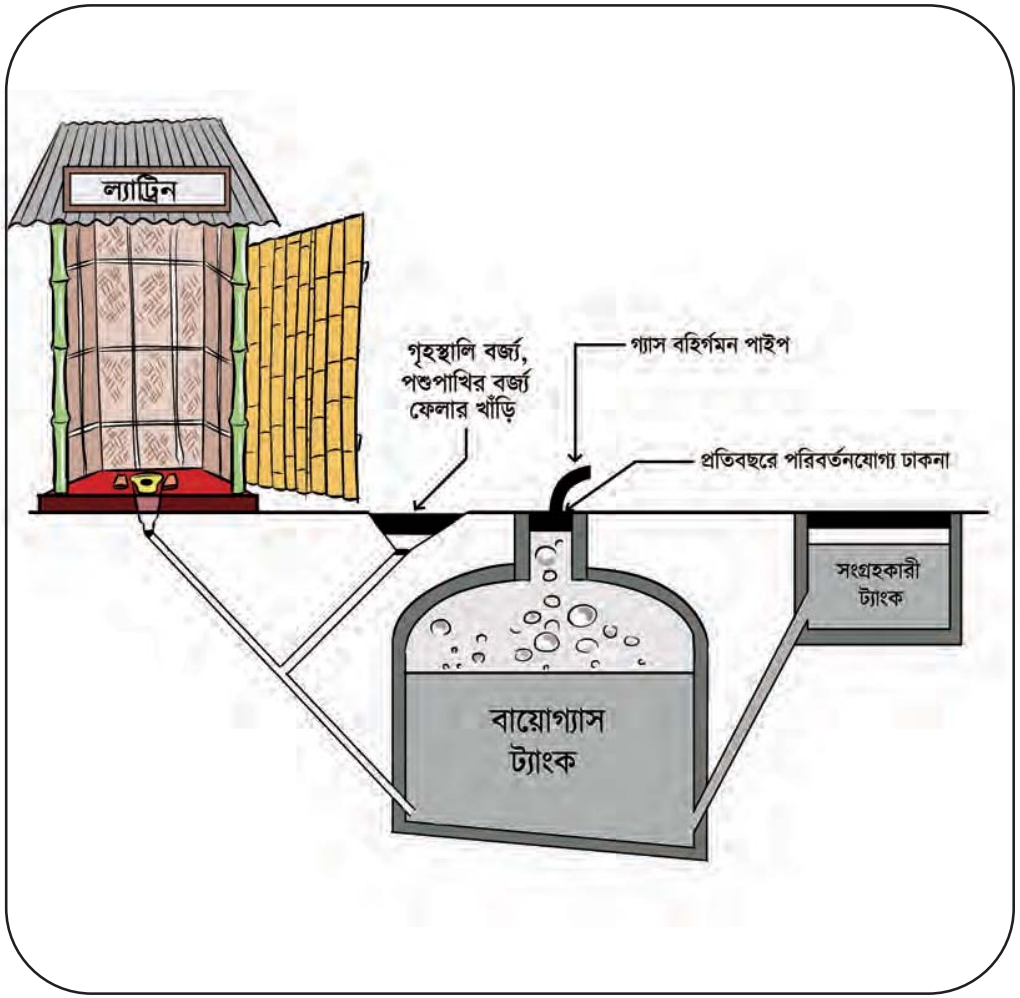

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল

যেকোনো পচনশীল বস্তু বায়োগ্যাস তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন–

- মানুষ, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি ইত্যাদির মলমূত্র
- গৃহস্থালি বর্জ্য, যেমন– তরিতরকারি, ফল, মাছ, মাংস ইত্যাদির ফেলে দেওয়া অংশ
- লতাপাতা, কচুরিপানা ও বিভিন্ন পচনশীল আবর্জনা

বায়োগ্যাসের অনেক ধরনের সুবিধা রয়েছে। যেমন–

- ✔ অল্প জায়গায় এই প্ল্যান্ট তৈরি করা যায়।
- ✔ এককালীন খরচসাপেক্ষ হলেও একবার স্থাপনের পর এই প্ল্যান্ট অনেক দিন ব্যবহার করা যায়।
- ✔ আবর্জনা ও দুর্গন্ধমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে ওঠে।
- ✔ বায়োগ্যাসের বর্জ্য থেকে জমির জন্য উন্নত মানের সার পাওয়া যায়।
- ✔ যেসব জায়গায় গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সুবিধা এখনো পৌঁছেনি, সেখানেও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

বলো তো দেখি?

বায়োগ্যাস নবায়নযোগ্য নাকি অনবায়নযোগ্য– কোন ধরনের জ্বালানি?

গ্রিনহাউজ ইফেক্ট

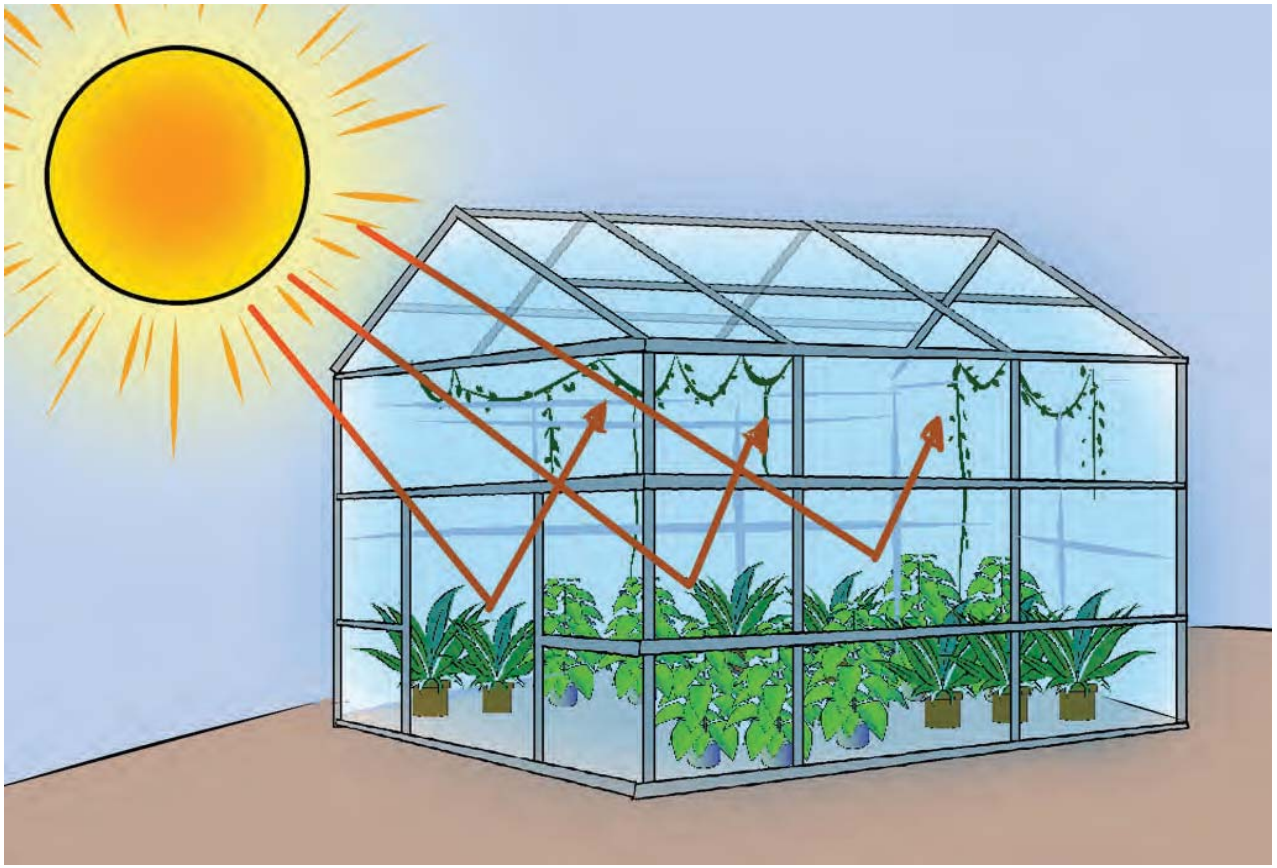

তোমরা কি কেউ গ্রিনহাউজ ইফেক্টের নাম শুনেছ? গ্রিনহাউজ হলো একধরনের কাচের ঘর। শীতের দেশে ঠাণ্ডার জন্য গাছপালা বা শাকসবজির ফলন সহজে হয় না। কিন্তু এই বিশেষ কাচের ঘরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে। ফলে গাছ জন্মানো সহজ হয়। শীতকালে দিনের বেলা সূর্যের আলো ও তাপ সহজেই কাচ ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করে এবং ঘর গরম রাখে। কিন্তু রাতে সূর্যের অনুপস্থিতিতে যখন বাইরের আবহাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তখন এই তাপ কাচ ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারে না। ফলে ঘরের ভেতরের আবহাওয়া বাইরের চেয়ে গরম থাকে। সবুজ গাছপালার ফলনে ব্যবহৃত হয় বলে এই ঘরকে বলে গ্রিনহাউজ।

নিজে করি!

যা যা লাগবে: দুটি কাচের জার, একটি শক্ত স্বচ্ছ পলিব্যাগ, থার্মোমিটার, কয়েক টুকরো বরফ।

কাচের জার দুটিতে সমপরিমাণ বরফ নিই। এবার একটি জারকে পলিব্যাগ দিয়ে সাবধানে মুড়ে রাখি, যেন ভেতরের বাতাস সহজে বেরোতে না পারে। দুটি জারকেই কিছুক্ষণ রোদে রেখে দিই।

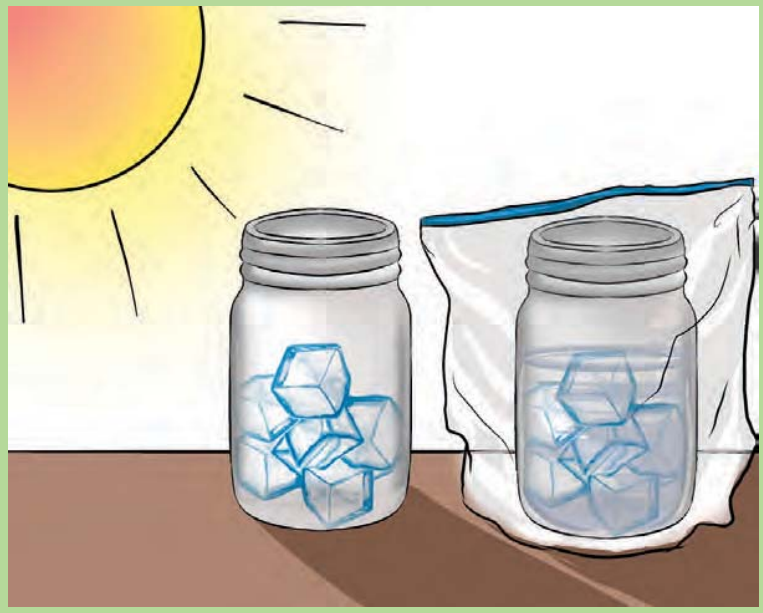

কিছুক্ষণ পর বরফগুলো গলতে শুরু করবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পলিব্যাগে মোড়ানো জারের বরফ দেখবে, কিছুটা তাড়াতাড়ি গলতে শুরু করেছে! তার মানে এই জারের তাপমাত্রা বেশি। বিশ্বাস না হলে থার্মোমিটার দিয়ে দুটি জারের ভেতরের তাপমাত্রা মেপে দেখো!

বলো তো, এই পার্থক্য কেন হলো?

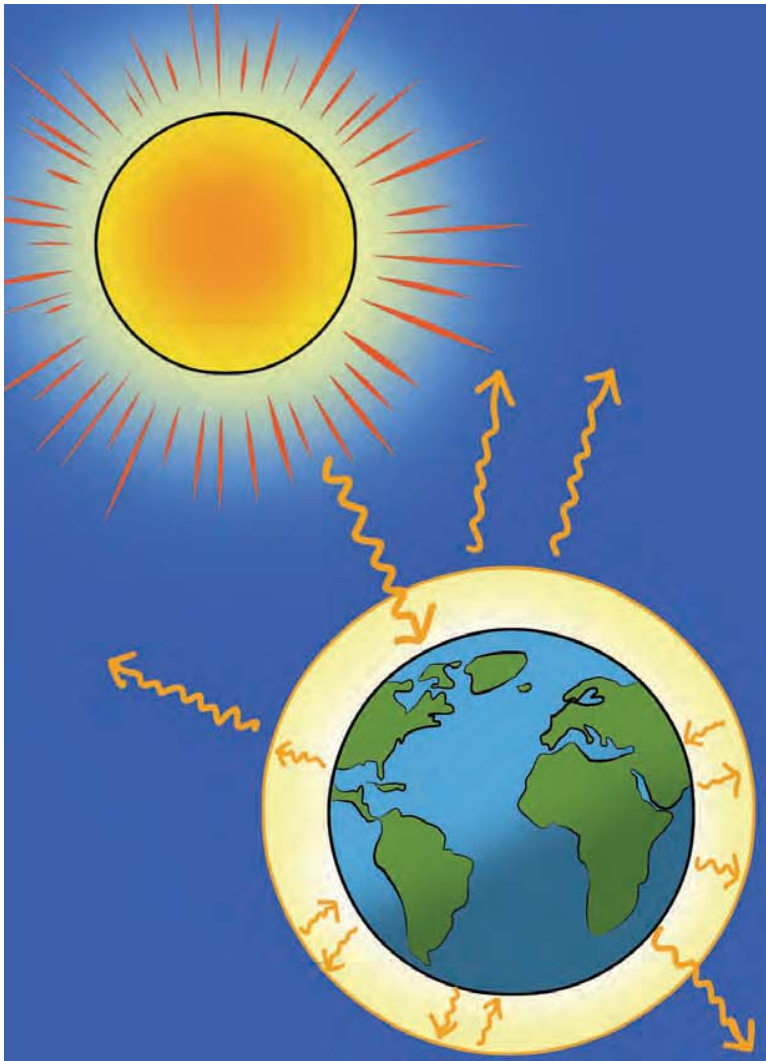

পৃথিবীকেও এ রকম একটা গ্রিনহাউজ হিসেবে কল্পনা করা যায়। আমাদের পৃথিবীর চারপাশজুড়ে যে বায়ুমণ্ডল, তাই এখানে গ্রিনহাউজের কাচের ঘরের মতো কাজ করে। মানে দিনের বেলা সূর্যের যে তাপ ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়, তাকে শুষে রাখে বায়ুমণ্ডল, রাতের বেলা যখন আকাশে সূর্য থাকে না, তখনো এই তাপ বায়ুমণ্ডল থেকে বেরিয়ে যেতে পারে না; তাই পৃথিবী রাতেও উষ্ণ থাকে। গ্রিনহাউজের মতো তাপ ধরে রাখে বলে পৃথিবীকেও তাই গ্রিনহাউজের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই পুরো প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে বেশ কিছু বিশেষ গ্যাস, যেমন– কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি। এদের বলে গ্রিনহাউজ গ্যাস। এই গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডই প্রধান ভূমিকা পালন করে।

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ, কার্বন ডাই-অক্সাইড তো তাহলে অনেক উপকারী গ্যাস! গ্রিনহাউজ গ্যাস না থাকলে তো রাতের বেলা ঠাণ্ডায় জমে যেতাম আমরা সবাই! ঠিক কথা। কিন্তু পৃথিবীর যতটুকু উষ্ণতা প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি তাপ যদি বায়ুমণ্ডল ধরে রাখে, তাহলে কী হবে বলো তো?

ঠিক বলেছ! পৃথিবীর যতটুকু তাপ প্রয়োজন, তার বেশি তাপ যদি বায়ুমণ্ডলে আটকে থাকে, তাহলে এর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে মাত্রাতিরিক্ত বেশি। আর এই প্রভাবকেই বলে গ্রিনহাউজ ইফেক্ট বা গ্রিনহাউজ প্রভাব। সত্যি বলতে, এ মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি হলো এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি। বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ অনেক অনেক বেশি বেড়ে যাওয়ায় গত কয়েক দশকে পৃথিবীর তাপমাত্রা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বছরের পর বছর অতিরিক্ত বাড়তে থাকায় কাচের জারের বরফের মতো মেরু অঞ্চলে জমে থাকা বিপুল পরিমাণ বরফও এমনকি গলতে শুরু করেছে! এই অতিরিক্ত পানি সমুদ্রে মিশে সমুদ্রের উচ্চতা বাড়িয়ে দিচ্ছে দিন দিন। এ রকম চলতে থাকলে আমাদের বাংলাদেশের মতো নিচু দেশগুলো একসময় সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা আছে!

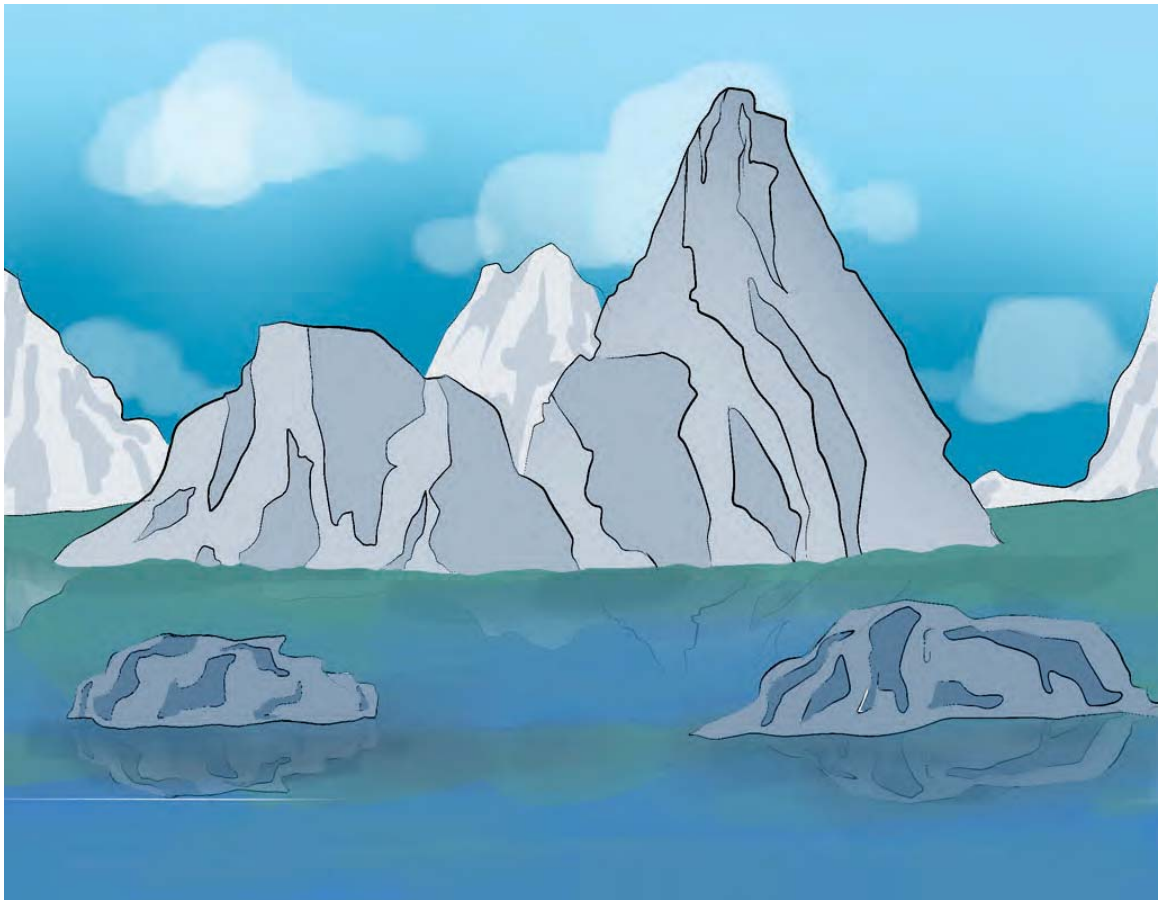

এখন কথা হলো, এই গ্রিনহাউজ গ্যাসের বৃদ্ধি কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সে জন্য আগে জানতে হবে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ এই গ্যাসগুলো বৃদ্ধির কারণ। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে যাওয়াও আসলে একধরনের বায়ুদূষণ।

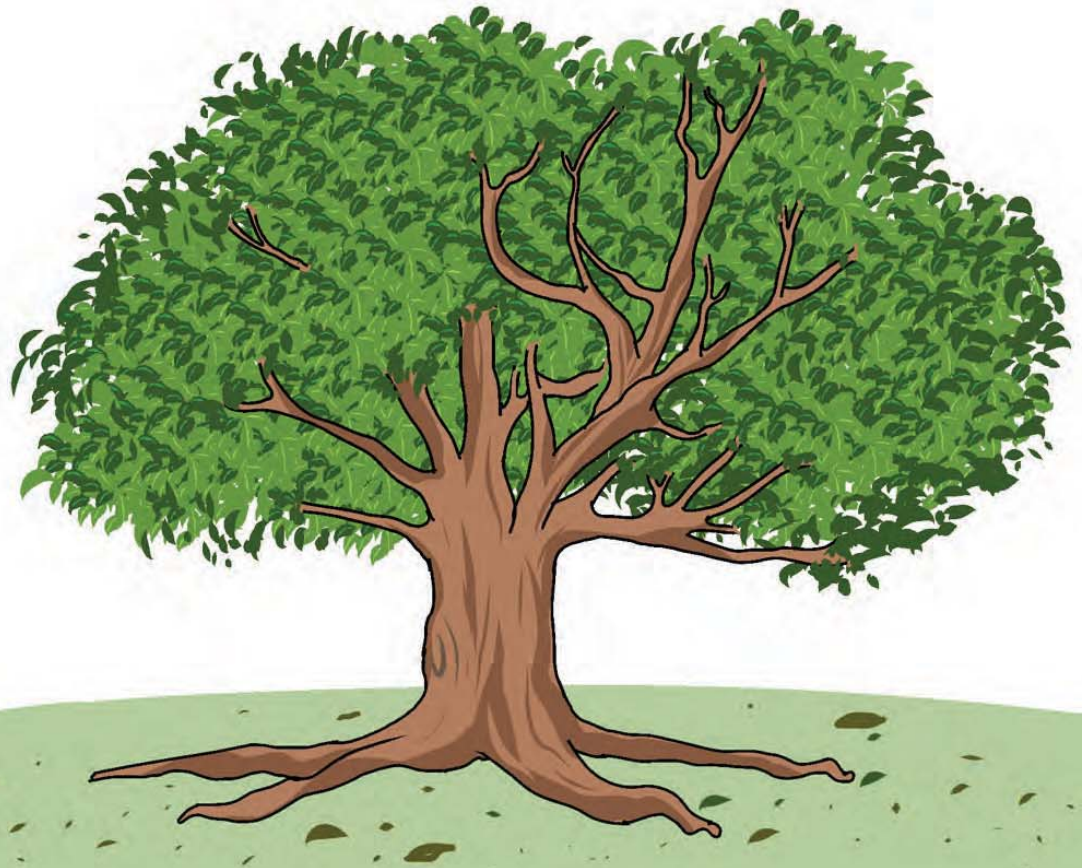

কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের সবচেয়ে বড় উৎস হলো বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, যানবাহন, কলকারখানা ইত্যাদি। যেখানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় জীবাশ্ম জ্বালানি। তোমরা জেনে অবাক হবে, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোই কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনে সবচেয়ে এগিয়ে!! তোমরা বলতে পারো, কার্বন ডাই-অক্সাইড ঠেকাতে গিয়ে সব কলকারখানা, যানবাহন বন্ধ করে দিলে চলবে কী করে? এর একটা ভালো সমাধান হলো নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো। নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস সম্পর্কে আমরা আগের অধ্যায়ে পড়েছি। অন্যদিকে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো বেশি বেশি গাছ লাগানো। আমরা জানি, গাছ খাদ্য তৈরিতে এই গ্যাস ব্যবহার করে। পৃথিবীর জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষা করতে বনভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই বন রক্ষা এবং বনায়ন করা আসলে আমাদের নিজেদের তাগিদেই প্রয়োজন।

ওজোন স্তর রক্ষা

উহুঁ! তোমরা যেই ওজন ভাবছ, সেই ওজনের কথা হচ্ছে না এখানে! ওজোন হলো একধরনের গ্যাস। বায়ুমণ্ডলে বেশ উঁচুতে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পুরু ওজোন গ্যাসের একটি স্তর আছে। এই স্তরটি পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য খুবই প্রয়োজন। সূর্য থেকে যেসব ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি নির্গত হয়, তা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে এই ওজোন স্তর।

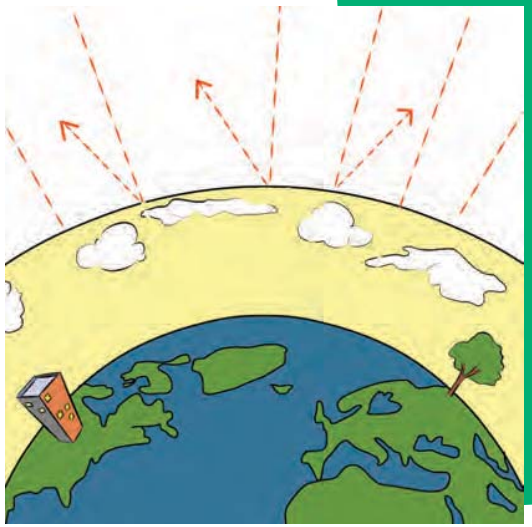

প্রশ্ন হলো, এই অতিবেগুনি রশ্মি কেন ক্ষতিকর? এই প্রশ্নের অনেকগুলো উত্তর আছে। প্রথমত, মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য বিশাল হুমকি এই রশ্মি। এই অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে এলে ত্বকের ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে! এ ছাড়া গোটা জীবজগতের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়বে এই রশ্মির কবলে পড়লে। সবচেয়ে ভয়ংকর তথ্য হলো, পানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব যাদের বলে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন তারা পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! সাদা চোখে হয়তো এর বিপদটা টের পাচ্ছ না তোমরা। হয়তো ভাবছ এসব ছোটখাটো জীব না থাকলে পৃথিবীর এমন কী যায় আসে! কিন্তু একটু ভেবে দেখো, এই ক্ষুদ্র জীবগুলো খেয়ে কোনো না কোনো জীব বেঁচে থাকে। যেমন– ছোট মাছ ইত্যাদি। আবার এসব ছোট প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকে আরেকটু বড় জীবেরা। এভাবে পৃথিবীর সব জীবই একে অপরের ওপর নির্ভর করে। কোনো একটা প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে তার জন্য গোটা জীবজগৎকেই ভুগতে হবে! কাজেই সব জীবের অস্তিত্বই আমাদের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বুঝতেই পারছ, বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর আমাদের জন্য কতটা দরকারি। কিন্তু ভয়ের কথা হলো, এই মহা-উপকারী ওজোন স্তর দিনে দিনে ক্ষয়ে যাচ্ছে, আর তা ঘটছে আমাদের দোষেই! এই স্তর আমরা প্রতিনিয়ত ক্ষয় করে চলেছি বায়ুদূষণের মাধ্যমে। বায়ুতে নির্দিষ্ট কিছু গ্যাসের অতিরিক্ত বৃদ্ধি ওজোন স্তরের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে! গ্রিনহাউজ ইফেক্টের জন্য যেমন উন্নত দেশগুলো বেশি দায়ী, ওজোন স্তরের ক্ষয়ের জন্যও বেশি দায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলোই। কারণ, এর জন্য দায়ী যেসব যৌগ, সেগুলো প্রধানত নির্গত হয় বিভিন্ন কলকারখানা থেকে। ওজোন স্তরের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে সিএফসি (ক্লোরোফ্লোরোকার্বন, CFC)। সিএফসি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে কলকারখানাগুলো সিএফসি নির্গমন করে থাকে। কলকারখানার ওপর দায় চাপালেও আমরাও কিন্তু জেনে, না জেনে বিভিন্নভাবে বাতাসে সিএফসির পরিমাণ বাড়িয়ে চলেছি! আমরা বিভিন্ন কাজে যে স্প্রে অ্যারোসল ব্যবহার করি, সেগুলোও সিএফসির একটা বড় উৎস। এ ছাড়া আমাদের ব্যবহার্য বিভিন্ন ইলেকট্রনিকস, যেমন– ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশনার ইত্যাদিও বাতাসে সিএফসি নির্গমন করে থাকে। বেশ কিছু বছর ওজোন স্তর বাঁচানোর জন্য সারা পৃথিবীর সচেতন মানুষেরা বেশ নড়েচড়ে বসেছেন। এর মধ্যে বেশ কিছু দেশের শিল্পক্ষেত্রে সিএফসি নির্গমনের ওপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়েছে!

পানিদূষণ

নিচের ছবিগুলো দেখো। বলো তো, এর মধ্যে কোন উৎসের পানি ব্যবহার নিরাপদ?

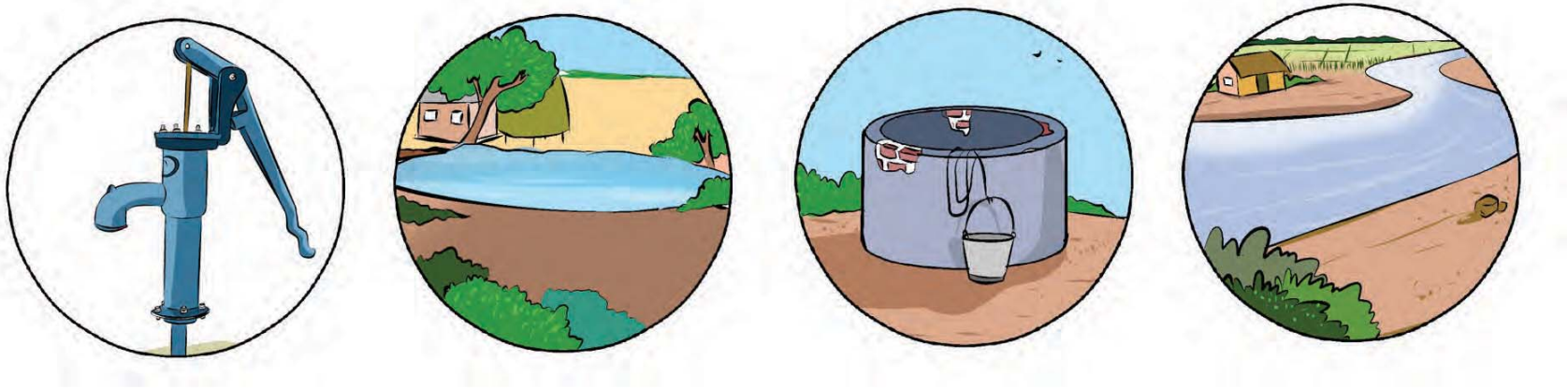

পানি আমাদের পরিবেশের অত্যাবশ্যকীয় ও নিত্যব্যবহার্য উপাদান। কিন্তু প্রকৃতিতে এর ভাণ্ডার মোটেও অফুরন্ত নয়! নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ। কারণ, আমরা তো সব সময়েই জেনেছি, পৃথিবীর চার ভাগের প্রায় তিন ভাগজুড়ে পানি আর এক ভাগ মাটি! অবাক ব্যাপার হচ্ছে, এই বিশাল জলভাণ্ডারের এক ভাগেরও কম আমরা ব্যবহার করতে পারি, আর বাকি পুরোটাই লবণাক্ত পানি! এই যে বিশাল বিশাল মহাসমুদ্র, এর পুরোটাই আসলে লবণাক্ত পানি, যা অনেক জীবের বাসস্থান; কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের কাজে ব্যবহার করা যায় না। মিঠা পানির উৎস মূলত নদী, পুকুর, খালবিল এবং মাটির নিচের পানির স্তর। এর মাঝে সব উৎসের পানি নিরাপদ নয়। তাই মূলত আমরা ব্যবহার করি মাটির নিচ থেকে উত্তোলিত পানি। নলকূপের পানি মোটামুটি নিরাপদ, যদি আর্সেনিকযুক্ত না হয়। তবে ভূপৃষ্ঠের অন্যান্য উৎস যেমন– খালবিল, পুকুর ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত যে পানি, তাও ব্যবহার করা যায়, কিন্তু পান করার আগে ভালো করে ফুটিয়ে ও ফিল্টার করে নিতে হবে।

আর্সেনিক একধরনের খনিজ পদার্থ, যা পানিতে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি থাকলে তা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই পানি টানা ব্যবহার করলে ত্বকের একধরনের ঘা বা ক্ষত হয়, যাকে চলতি ভাষায় আর্সেনিক রোগ বলে। আর্সেনিকযুক্ত পানি ফুটিয়ে খেলেও আর্সেনিকের মাত্রা কমে না। তাই সাধারণত কোনো টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেলে তাতে লাল রং করে দেওয়া হয় সবার সাবধানতার জন্য।

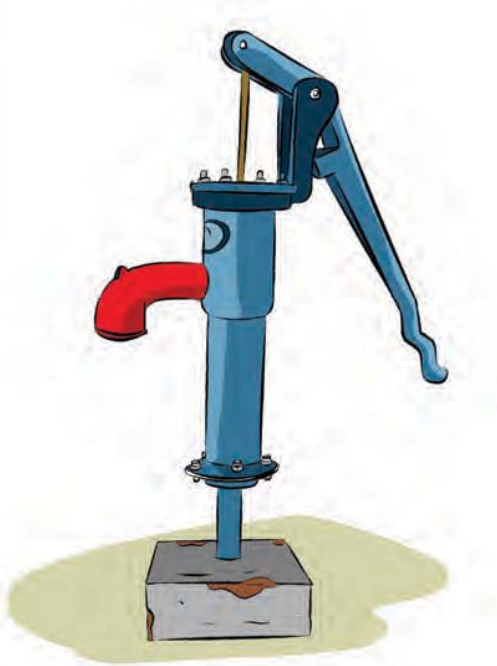

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, আর্সেনিকযুক্ত পানি দীর্ঘদিন পান করলে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় মানুষের যকৃৎ, ত্বক, কিডনি, ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের ক্যানসার হতে পারে। এ ছাড়া আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করলে মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়।

পানিতে কী পরিমাণ আর্সেনিক আছে এবং একজন ব্যক্তি কত দিন ধরে এই পানি পান করছে, তার ওপর মৃত্যুঝুঁকি নির্ভর করে। আর্সেনিকের বিষক্রিয়া মৃত্যুর প্রধান কারণ না হলেও তা মৃত্যুঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ! পানিতে আর্সেনিক বেশি থাকলে মৃত্যুঝুঁকিও বেশি। প্রথম সংক্রমণ হাতে ও পায়ে দেখা দেওয়ায় অনেক সময় হাত-পা কেটেও ফেলতে হয়। পাশের ছবিতে আর্সেনিকে আক্রান্ত ব্যক্তির হাতে-পায়ে সংক্রমণ দেখতে পাচ্ছ?

বাংলাদেশের বেশ কিছু অঞ্চলে পানিতে পরীক্ষা করে সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ আর্সেনিক পাওয়া গেছে। পাশের মানচিত্রে বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় আর্সেনিকের সংক্রমণ দেখানো হলো।

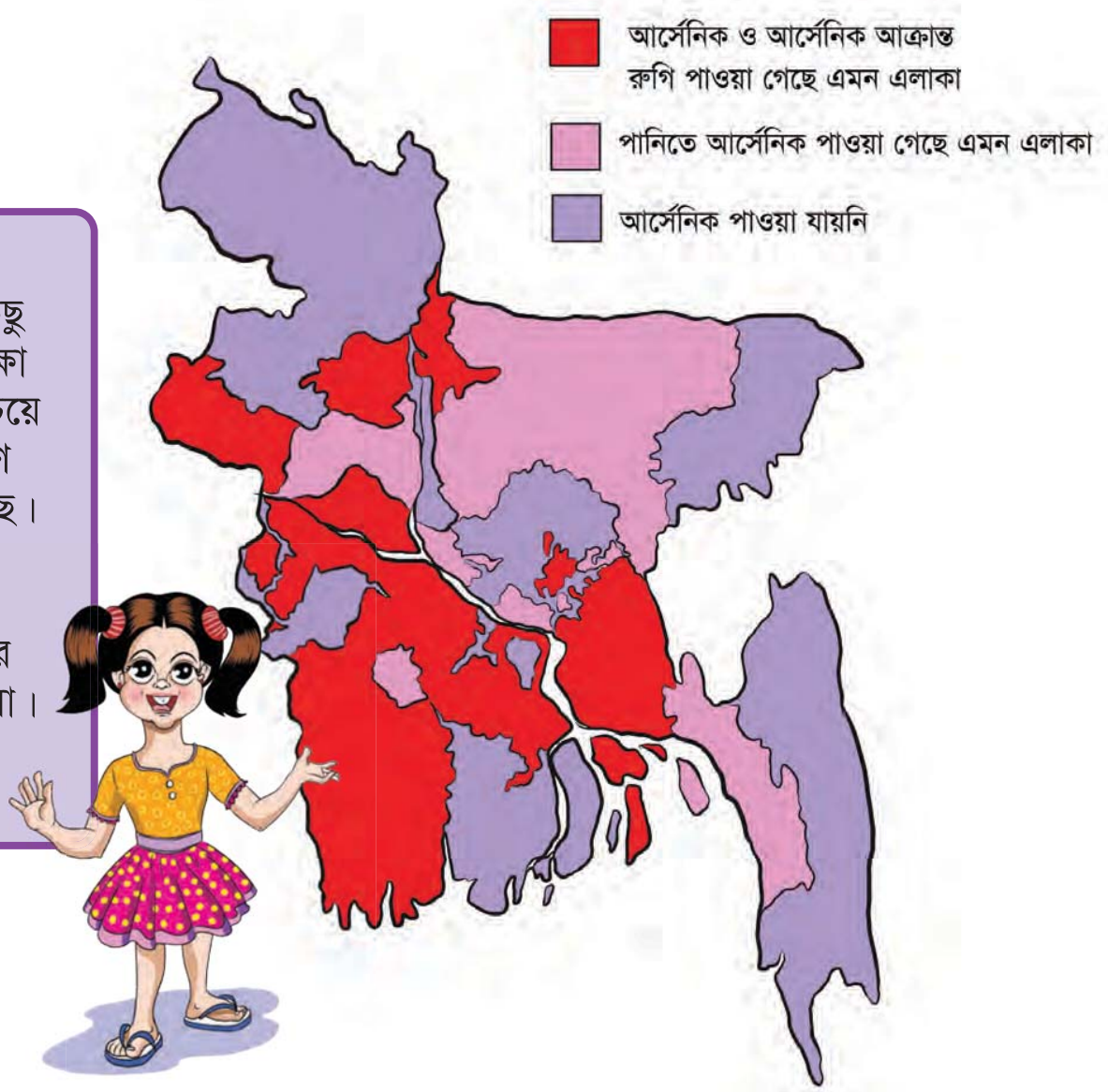

আর্সেনিকের বিষক্রিয়া থেকে মুক্তির জন্য প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই বেশি জরুরি। এ ক্ষেত্রে আমরা কী কী করতে পারি?

১। আর্সেনিকযুক্ত নলকূপের পানি পান ও রান্নার কাজে ব্যবহার না করা।

২। কাছেপিঠে আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ পাওয়া না গেলে পুকুর বা নদীর পানি বিশুদ্ধ করে ব্যবহার করা যায়। সে জন্য এক কলসি পানিতে আধা চামচ ফিটকিরি মিশিয়ে ২-৩ ঘণ্টা রেখে দিয়ে, পরে ওপর থেকে তলানিবিহীন পরিষ্কার পানি পান করতে হবে।

৩। বৃষ্টির পানি সম্পূর্ণ আর্সেনিকমুক্ত ও নিরাপদ। তাই এই পানি সংগ্রহ করে পান করা এবং রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায়।

আর্সেনিক দূর করতে তিন কলসি পদ্ধতি

আর্সেনিকযুক্ত পানি থেকে আর্সেনিকের মাত্রা কমিয়ে আনার একটি চমৎকার সহজ পদ্ধতি আছে। এর নামটাও মজার– তিন কলসি পদ্ধতি!

এ জন্য পাশের ছবির মতো তিনটি কলসি একটির ওপর অপরটি রাখতে হয়। ওপরের কলসি দুটোর নিচে ফুটো করে পানি নির্গমনের ব্যবস্থা থাকবে, আর কলসির তলদেশে পরিষ্কার সিনথেটিক কাপড় কয়েক প্রস্থ বিছিয়ে নিতে হবে। সবচেয়ে ওপরের কলসিতে রাখতে হয় লোহার কণা ও মোটা দানার বালু; মাঝখানের কলসিতে রাখতে হয় কাঠ কয়লা ও মিহি দানার বালু এবং একেবারে নিচের কলসি থাকবে খালি। আর্সেনিকযুক্ত পানি এনে ঢালতে হবে সবচেয়ে ওপরের কলসিতে, তা ক্রমান্বয়ে পরিষ্কার, বিশুদ্ধ ও আর্সেনিকমুক্ত হয়ে জমা হবে সবচেয়ে নিচের কলসিতে।

এই পদ্ধতিতে পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা অনেকখানি কমিয়ে এনে তা ব্যবহারের উপযোগী করা সম্ভব! আর্সেনিকের মাত্রা কমাতে এই প্রক্রিয়াটি বেশ কার্যকর, তবে তিন-চার মাস পর পর বদলে দিতে হয়। না হলে এর কার্যকারিতা কমে আসে। আর পরিস্রুত পানি নিচের কলসি থেকে ঢেলে ব্যবহারের আগে ফুটিয়ে নেওয়া ভালো। তাহলে জীবাণু সংক্রমণের ভয় থাকে না!

এই প্রক্রিয়ায় কলসির বদলে প্লাস্টিকের বালতিও ব্যবহার করা যায়।

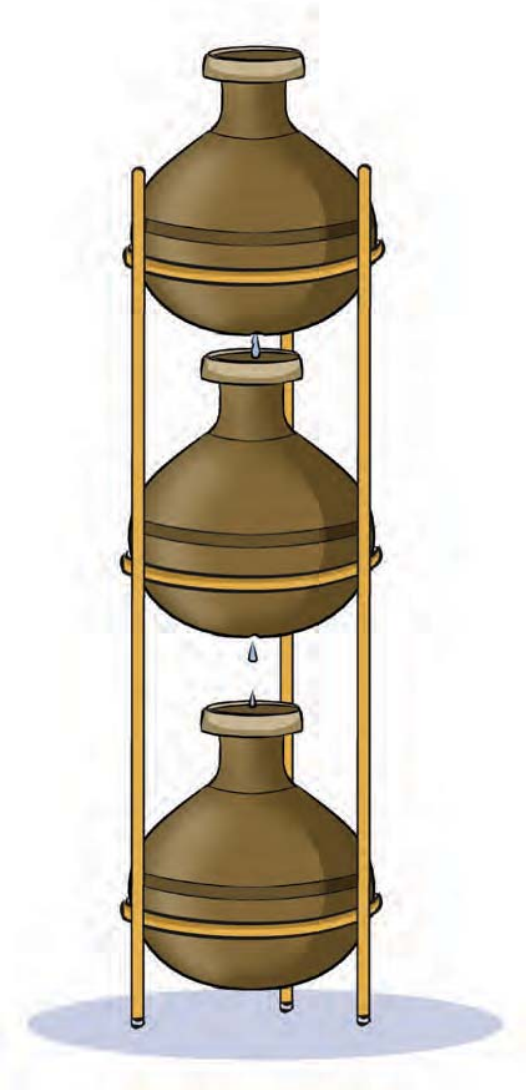

পান করার উপযোগী পানি যে খুব সুলভ ও যথেচ্ছ ব্যবহারযোগ্য নয়, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ! এখন একটু চিন্তা করে দেখো তো, এই মহামূল্যবান পানি ব্যবহারে আমরা কি যথেষ্ট সচেতন? রান্না, খাওয়া, গোসল বাদেও আমরা গৃহস্থালি যাবতীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করি মাটির নিচ থেকে উত্তোলিত পানি। এর ফলে আমাদের মাটির নিচের এই পানির স্তর দিন দিন আশঙ্কাজনকভাবে নিচে নেমে যাচ্ছে। এতে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে পানি হয়ে পড়ছে দুর্লভ! তোমরা অনেকেই হয়তো দেখেছ, সকালবেলা বিভিন্ন এলাকায় পানির জন্য নিম্নবিত্ত মানুষের লাইন ধরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে!

জানো কি?

সকালে উঠে এবং রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে দাঁত মাজতে গেলে দাঁত মাজার সময়টুকু আমরা অনেক সময় পানির ট্যাপ খোলা রাখি। হয়তো ভাবি, এটুকু সময়ে কী আর পানির অপচয় হবে? কিন্তু তোমরা জানো কি, শুধু একজন মানুষের দাঁত মাজার ওই সময়টুকু ট্যাপ খোলা রাখার কারণে প্রতি মাসে কত পানির অপচয় হয়? গড়ে সাড়ে সাত শ লিটারের চেয়েও বেশি!!

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ

যেসব এলাকায় নিরাপদ পানির উৎস সুলভ নয়, কিংবা আর্সেনিকের প্রকোপ বেশি, বৃষ্টির পানি তাদের জন্য বেশ ভালো একটি সমাধান। তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ; বৃষ্টির পানি পুরোপুরি নিরাপদ তো? কিংবা বৃষ্টির পানি জমা করে রাখার উপায়ই বা কী?

তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, বৃষ্টির পানি পান ও ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবে বৃষ্টি শুরু হওয়ার প্রথম পাঁচ মিনিট– মানে বৃষ্টির প্রথম পশলা শেষ হওয়ার পর সেই পানি ব্যবহারের উপযোগী। কারণ, আমাদের বায়ুমণ্ডলে প্রচুর ধুলাবালি ও রোগ-জীবাণু থাকে, যা বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর প্রথম কয়েক মিনিটে ধুয়ে যায়। বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই বৃষ্টির পানি ব্যবহারের অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এখন কথা হচ্ছে, এই পানি জমা করে রাখার উপায় কী! বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের বেশ কিছু পদ্ধতি আছে, যা খুব বেশি ব্যয়বহুলও নয়। এই পানি ধরে রাখার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতির একটি পাশের ছবিতে দেখানো হলো। আমরা অনেকেই টিনের বাড়িতে থাকি, টিনের চালে জমা হওয়া পানি পাইপের মাধ্যমে গড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করে এভাবে সেই পানি একটি ট্যাংকে বা জলাধারে জমা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। টিনের চাল না থাকলে খোলা জায়গায় কোনো পরিষ্কার তেরপল টানিয়ে তার মাঝখানে ফুটো করে নিচে রাখা জলাধারে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়।

মাটির উপরিভাগের যে পানির উৎস, যেমন– খালবিল, নদী ইত্যাদির পানিও আমরা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে পারি, যদি একটু সচেতন হই। কাজেই আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই এসব উৎসের পানি আমাদের যথাসম্ভব পরিষ্কার রাখা উচিত। অথচ শহরাঞ্চলে আমাদের আশপাশে পুকুর, ডোবা, নালার দিকে তাকালে আমরা দেখি উল্টো চিত্র। গত কয়েক বছরে একের পর এক জলাশয় ভরাট করে গড়ে উঠেছে বহুতল ভবন– নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই। অন্যদিকে আমরা অনেক সময়েই পলিথিনের প্যাকেট, প্লাস্টিকের বোতল বা এ ধরনের অপচনশীল আবর্জনা ড্রেনে বা নালায় ফেলে দিই। এসব জিনিস পানিতে পচে না গিয়ে জমে গিয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে, পানির স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা দেয়। এর ফল আমরা যারা শহরে থাকি তারা তো নিয়মিতই দেখতে পাচ্ছি; সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তাঘাটে পানি জমে দুর্ভোগে পড়তে হয়। একে তো শহরে জলাশয়ের অভাব, উপরন্তু পানিনিষ্কাশনের ব্যবস্থাও নষ্ট করছি আমরা প্রতিনিয়ত। ফলে শহরের পরিবেশ মারাত্মক হুমকির মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে দ্রুতই এ শহরগুলো বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে!

জানো কি?

অনেক সময় আমরা দৈনন্দিন কাজ শেষে পানির ট্যাপ ঠিকমতো বন্ধ না করেই টয়লেট থেকে বেরিয়ে যাই। ট্যাপ থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তেই থাকে অনবরত। অনেক সময় আবার ট্যাপ নষ্ট হবার ফলেও ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে থাকে, আমরা আলসেমি করে হয়তো দ্রুত তা সারানোর ব্যবস্থা করি না। কিন্তু তোমরা জানো কি, আপাতদৃষ্টিতে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে মনে হলেও, এ রকম একটা ট্যাপ থেকে বছরে কত পানির অপচয় হয়?

প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার লিটার!!

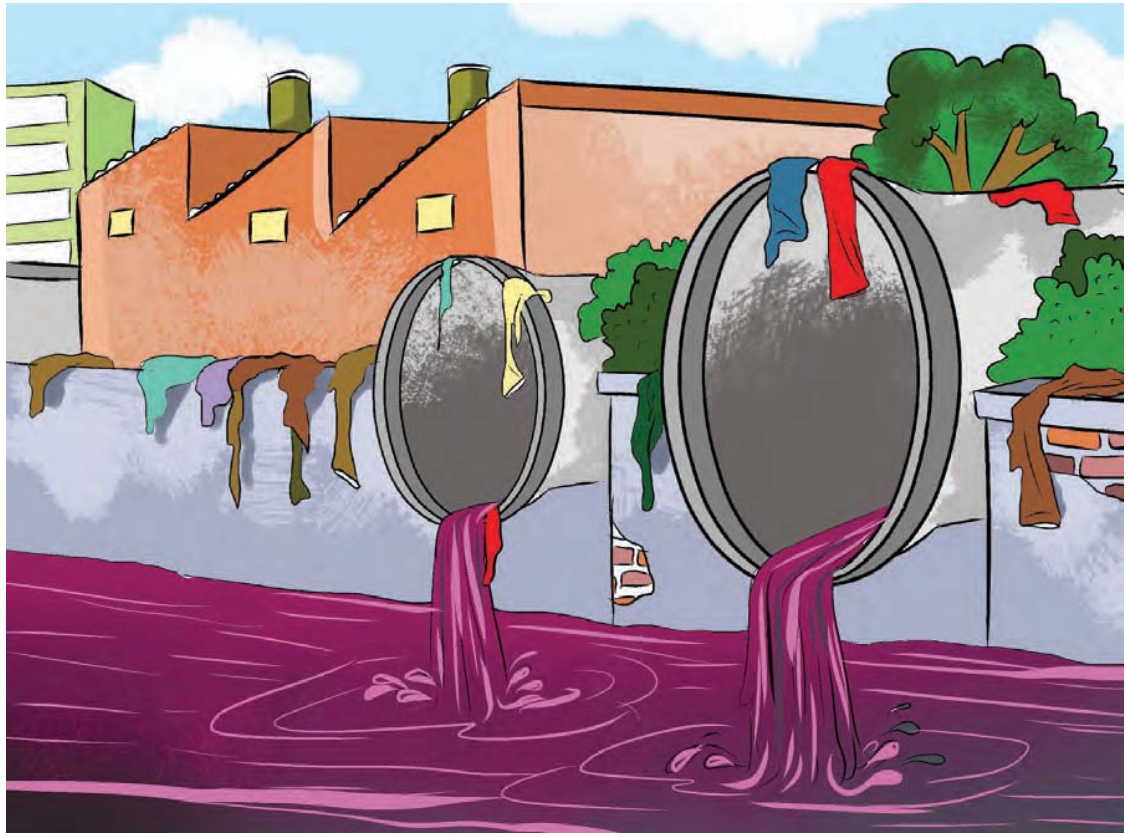

একসময় বলা হতো, নদীর দেশ বাংলাদেশ। অথচ পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে এ দেশের অনেক নদী আজকে মৃতপ্রায়। একে তো নদীর কিনার ধরে গড়ে ওঠা অজস্র কলকারখানার বর্জ্য ক্রমাগত নদীর পানিতে মিশে একে করে তুলছে বিষাক্ত; অন্যদিকে আমাদের অবহেলা ও অসচেতনতা তো আছেই! একসময়ের প্রমত্তা বুড়িগঙ্গার দিকে তাকালেই এর ভয়াবহতা টের পাওয়া যায়। তোমরা যারা বুড়িগঙ্গা নদী দেখোনি, তারাও যদি কখনো সুযোগ পাও, দেখে এসো ঢাকার ঐতিহ্যবাহী এই নদীর এখনকার হাল! নদীর কাছে যেতেই প্রকট দুর্গন্ধে নাকচাপা দিতে হয়! তার চেয়েও ভয়ংকর তথ্য হলো, এই নদীর পানি এতটাই বিষাক্ত হয়ে গেছে যে, বিশাল এই নদীতে কোনো মাছ এখন আর টিকে থাকতে পারে না।

আমাদের নিজেদের এলাকায় বিভিন্ন জলাশয় রক্ষা করতে আমরা কী ভূমিকা রাখতে পারি?

তোমরা সবাই চার-পাঁচজনের ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যাও। এবার তোমাদের বাড়ি, স্কুল ও আশপাশের এলাকার মধ্যে ভাগ করে একেক দল একেকটা জায়গা নির্দিষ্ট করে নাও। এখন, তোমাদের কাজ হবে–

- ✔ তোমাদের নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে পানির উৎস কী কী আছে, তা নোট করা।
- ✔ কী কী ভাবে এসব জলাশয়ের পানি দূষিত হচ্ছে, তা অনুসন্ধান করা।
- ✔ এই দূষণ রোধ করার উপায় খুঁজে বের করা এবং এলাকার অন্য মানুষদের এ ব্যাপারে সচেতন করে তোলা।
- ✔ তোমাদের পুরো কাজের বিবরণ ছবি এঁকে ও লিখে ক্লাসের সবার সামনে একটা পোস্টারে উপস্থাপন করা এবং প্রত্যেক দলের সবার সঙ্গে অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করা।

আমাদের আশপাশের সবকিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশের প্রতিটি উপাদান একে অপরের ওপর কোনো না কোনোভাবে নির্ভর করে। বাসাবাড়ি করার জন্য অবাধে বনজঙ্গল কেটে, পাহাড় কেটে আমরা যখন নিজেদের সুবিধার ব্যবস্থা করি, তখন আসলে আমরা নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনি! নিজেদের লোকালয় পরিষ্কার রাখতে গিয়ে আমরা যখন নদী ধ্বংস করি, তার ভয়াবহ ফল আমাদেরই ভোগ করতে হবে। আমরা মানুষেরাও প্রকৃতি, পরিবেশের একটা অংশ। প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে আত্মীয়তা করেই তাই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে!

নির্ঘণ্ট

Measurement = পরিমাপ

Length = দৈর্ঘ্য

Mass = ভর

Time = সময়

Area = ক্ষেত্রফল

Volume = আয়তন

Derived = লব্ধ

Speed = গতি

Velocity = বেগ

Density = ঘনত্ব

Measuring cylinder = মাপচোঙ
CC (Cubic Centimeter) = ঘন সেন্টিমিটার
Matter = পদার্থ
Shape = আকৃতি
Size = আকার
Reversible Change = উল্টা পরিবর্তন
Physical Change = ভৌত পরিবর্তন
Chemical Change = রাসায়নিক পরিবর্তন
Sedimentation = থিতানো
Filtration = ছাঁকন বা পরিস্রাবণ
Evaporation = বাষ্পীকরণ

Decantation = আস্রাবণ
Condensation = ঘনীভবন
Distillation = পাতন
By Product = উপজাত
Force = বল
Pressure = চাপ
Motion = গতি
Speed = দ্রুতি
Velocity = বেগ
Work = কাজ
Energy = শক্তি
Power = ক্ষমতা
Submarine = ডুবোজাহাজ

ISBN-13: 978-9843368768